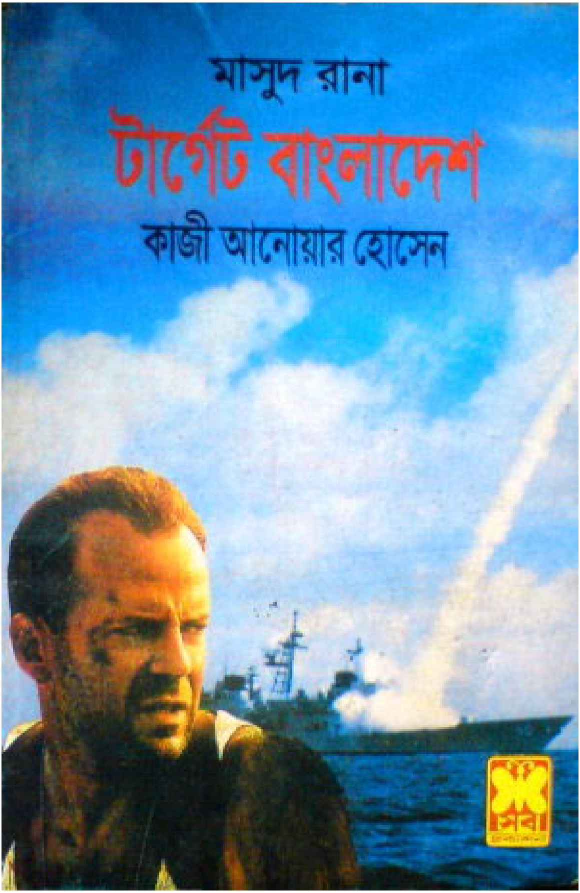

মাসুদ রানা
টার্গেট বাংলাদেশ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা

মাসুদ রানা

টার্গেট বাংলাদেশ

কাজী আনোয়ার হোসেন

এক

পাহাড়-চূড়া, উপত্যকা, মালভূমি ও গিরিখাদ সাদা তুষারে ঢাকা পড়ে আছে, আসা-যাওয়ার পথ হয়ে উঠেছে পিচ্ছিল ও বিপজ্জনক, অবশ্য সেজন্যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসার কাজ থেমে নেই। এশিয়া, ইউরোপ আর আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসেছে ওরা। দরদাম ঠিক হলে অনেকেই শুধু বায়না করে যাবে, অস্ত্রের চালান ডেলিভারি নেবে অন্যত্র; আবার কেউ কেউ ব্রীফকেস ভর্তি ডলার নিয়ে এসেছে, প্রয়োজনীয় জিনিস পাওয়া গেলে এখুনি কিনে নিয়ে যাবে।

এ সেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ খাইবার পাস, পাক-আফগান বর্ডারের ঠিক ওপরে। গিরিখাদটার ভেতর নির্জন ল্যান্ডিং স্ট্রিপটা প্রকৃতিরই অবদান, ওটা থাকায় জায়গাটা চোরা-কারবারীদের জন্যে আদর্শ একটা বাজার হয়ে উঠেছে। খাইবার পাস সরু, আঁকাবাঁকা একটা প্যাসেজ; হিন্দুকুশ পর্বতমালার সদস্য সাফিদ কুহ পাহাড়ের ভেতর দিয়ে বিস্তৃত- দুই দেশের মধ্যবর্তী দুর্গম ও বৈরী এলাকা পার হওয়ার একটা মাধ্যম। সমদ্ধ একটা ইতিহাস আছে খাইবার পাসের। যীশুর জন্মের পাঁচশো বছর আগে পারস্যের প্রথম দারিয়ুস এই গিরিপথ ধরে সিন্ধু নদ পর্যন্ত

এসেছিলেন। রাডইয়ার্ড কিপলিং তাঁর কবিতায় এই অঞ্চলের ব্রিটিশ আমলটাকে ধরে রেখেছেন। সমুদ্রসমতল থেকে তিন হাজার পাঁচশো ফুট ওপরে খাইবার পাস, পাহাড়শ্রেণীর ফাঁকে দুটো নদী বয়ে যাচ্ছে। শত শত বছর ধরে লোকজন কাফেলা নিয়ে আসা-যাওয়া করায় একটা পথ তৈরি হয়েছে, তবে সেটা বড় বেশি উঁচু-নিচু। পরে শক্ত ও সমতল একটা রাস্তা বানানো হয়। পাকিস্তানের দিকটায় রেললাইন আছে, চৌত্রিশটা টানেল আর চুরানব্বুইটা ব্রিজ ও কালভার্ট পেরিয়ে সীমান্তে পৌঁছুতে হয়েছে সেটাকে।

এয়ারস্ট্রিপ মানে পাহাড় ঘেরা একটা মালভূমি। সন্ত্রাসী ও চোরাকারবারীরা এক মাস পরপর কেনা-বেচার জন্যে মিলিত হয় এখানে। এটাই একমাত্র সময় যখন ঝগড়া-বিবাদ ভুলে শান্তি বজায় রাখা হয়, স্থগিত রাখা হয় প্রতিশোধ গ্রহণ, ঝেড়ে ফেলা হয় বিদ্বেষ ও সন্দেহ। এক মাস পরপর এই বাজারে ভাড়াটে সৈনিক, খুনী, সন্ত্রাসী, বিচ্ছিন্নতাবাদী, মৌলবাদী ফ্যানাটিক, চাঁদাবাজ ও মধ্যস্বত্বভোগীদের সমাবেশ ঘটে। ঠিক দাম দিতে পারলে সব জিনিসই পাওয়া যাবে এখানে- স্কাড মিসাইল, হাঙ্গেরিয়ান মর্টার, একে-ফরটিসেভেন, গ্রেনেড, রাসায়নিক অস্ত্র, হেলিকপ্টার গানশিপ, এবং এমনকি একজোড়া মিগ-টোয়েন্টিনাইনও আছে, পুরোপুরি ফুয়েল ভরা, সশস্ত্র, ওড়ার জন্যে তৈরি অবস্থায়।

কেউ গুনছে না, তবে আজকের বাজারে একশোর কিছু বেশি লোক জড়ো হয়েছে। ক্রেতা ও বিক্রেতাদের আমন্ত্রণ জানানো হয় তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে। অনেকেই উল্টো দিকে রওনা হয়ে, বহু ঘুরপথ পেরিয়ে এখানে পৌঁছায়। কোথাও কোন বিশৃংলা নেই, শান্ত

পরিবেশে কেনা-বেচা চলছে। চারদিকে সশস্ত্র গার্ডদের কড়া পাহারা, নিরাপত্তার কোন অভাব নেই। তবে এই বাজার কাদের আয়োজন, কারা নিরাপত্তার দিকটা দেখাশোনা করছে, সেটা কেউ জানে না। শুধু গুজব শোনা যায় নেপথ্যে আছে জার্মান মাফিয়া চক্র। ক্রেতা ও বিক্রেতার কাছ থেকে রসিদ ছাড়াই খরচার টাকা আদায় করা হয়। আমন্ত্রিত অতিথিরা আয়োজকদের পরিচয় নিয়ে মাথা ঘামায় না, তারা শুধু নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চায়। সশস্ত্র গার্ড আর ইনফ্রারেড গ্যাটলিং গান সহ রাডার ডিশ দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, দর কষাকষিতে মন দেয়।

কিন্তু সন্ত্রাসীরা জানে না যে তাদের সিকিউরিটি ফুটো করা হয়েছে। ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর কয়েকজন কর্মকর্তা ও সিক্রেট সার্ভিসের স্টাফ লন্ডনে বসে গোটা চোরা বাজারের ওপর নজর রাখছেন। বাজারে উপস্থিত তাঁদের একজন প্রতিনিধির কাছে লুকানো একটা ভিডিও ক্যামেরা আছে, স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সরাসরি সিগন্যাল পাঠাচ্ছে সে।

ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিচুয়েশন রূমে এক জোড়া বিশাল মনিটরের সামনে বসে আছেন ওঁরা। চোরা বাজারের রঙিন ও জ্যান্ত দৃশ্যাবলী বিস্মিত ও বিহ্বল করে তুলেছে সবাইকে। ওঁদের মধ্যে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের ডিরেক্টর মারভিন লংফেলো আছেন, আছেন তাঁর চীফ অভ স্টাফ বিল হ্যামারহেড, রুশ জেনারেল দিমিত্রি জুকোভস্কি, ব্রিটিশ অ্যাডমিরাল রবিনহুড, এবং আরও কয়েকজন সামরিক কর্মকর্তা। অ্যাডমিরাল রবিনহুডের আপত্তি সত্ত্বেও জেনারেল জুকোভস্কিকে আজ ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স হেডকোয়ার্টারে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মারভিন

লংফেলো, কারণ হিসেবে বলেছেন খাইবার পাসে আসলে কি ঘটছে তা রাশিয়ানদের নিজের চোখে দেখা উচিত। ফিল্ড থেকে ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট পাবার পর বিএসএস চীফ অভিযোগ করেছিলেন, খাইবার পাসে রাশিয়ার চোরাই অস্ত্র বেচা-কেনা চলছে। অভিযোগটা রাশিয়া প্রত্যাখ্যান করার পরই ডিফেন্স মিনিস্ট্রির সিচুয়েশন রূমে জেনারেল জুকোভস্কিকে আমন্ত্রণ জানান তিনি। কতিপয় মিলিটারি পাওয়ারহাউসের অন্যতম বলে গণ্য করা হয় অ্যাডমিরাল রবিনহুডকে, কর্তৃত্ব ফলাতে ভালবাসেন; তাঁর আপত্তি মর্যাদা না পাওয়ায় বিএসএস চীফের ওপর মনে মনে খেপে আছেন তিনি, সময় ও সুযোগ পেলে বদলা নিতে ছাড়বেন না।

সিচুয়েশন রূমটা বিশাল গুহার মত দেখতে, আটকোনা। একজোড়া সিনেমা-সাইজ ভিডিও স্ক্রীন রয়েছে দেয়ালে। মেঝের মাঝখানে বিভিন্ন স্তরে সাজানো রয়েছে কমপিউটর, ডেস্ক, টেলিফোন ছাড়াও বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার নানা সরঞ্জাম ও উপকরণ। সঙ্কটের সময় এই সিচুয়েশন রূমেই কঠিন সিদ্ধান্তগুলো নেয়া হয়। পরিস্থিতি সিরিয়াস হয়ে উঠলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর ডাক পড়ে। আজ অবশ্য ডাকলেও আসতে পারতেন না তিনি, পূর্ব-নির্ধারিত সফরে জার্মানীতে চলে গেছেন। তবে যাবার আগে পরিস্থিতি বুঝে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা তিনি অ্যাডমিরাল রবিনহুডকে দিয়ে গেছেন।

রুশ অস্ত্রের বিরাট একটা চালান খাইবার পাসে আনা হবে, এই খবর পাবার পর অ্যাডমিরাল রবিনহুড এইচএমএস চেস্টারফিল্ডকে গালফ অভ ওমানে টহল শুরু করার নির্দেশ

দিয়েছেন। সব রকম প্রস্তুতিই নেয়া আছে, প্রয়োজনে এই সিচুয়েশন রূমে বসেই চোরা বাজারে ক্রুজ মিসাইল নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিতে পারবেন তিনি। পাক ও আফগান সরকার আগেই অনুমতি দিয়ে রেখেছে, বাজারটা কেউ ধ্বংস করে দিতে পারলে খুশিই হয় তারা। বাজারের আয়োজকরা এত বেশি শক্তিশালী আর সংগঠিত যে কয়েকবার সৈন্য পাঠিয়েও কোন লাভ হয়নি। কিভাবে যেন আগাম খবর পেয়ে সটকে পড়ে তারা, দুর্গম পার্বত্য এলাকায় সমস্ত অস্ত্র লুকিয়ে ফেলে।

বিল হ্যামারহেড মাথায় একটা হেডসেট পরে আছেন, বাজারে উপস্থিত ক্যামেরা অপারেটরের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করছেন তিনি। হাতে লাল একটা লেযার পেন, সেটার সাহায্যে বিরাট স্ক্রীনে ফুটে ওঠা ছবিগুলোর দু'একটা চিহ্নিত করছেন বিস্ময়ে রুদ্ধবাক দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে। 'আমরা যেমন সন্দেহ করেছিলাম, সন্ত্রাসীরা এখানে নিয়মিতই অস্ত্র কিনতে আসে,' বললেন তিনি। 'ওদিকে ওটা চাইনিজ লংমার্চ স্কাড। বাম পাশে দেখুন, একজোড়া ফ্রেঞ্চ এ-সেভেনটিন অ্যাটাক হেলিকপ্টার, দশ জোড়া রাশিয়ান মর্টার...'

'চোরাই মাল,' বাধা দিয়ে বললেন জেনারেল জুকোভস্কি, চেহারায় বিব্রত ভাব।

'আর কাঠের বাক্সের ভেতর ওগুলো আমেরিকান রাইফেল, চিলিয়ান মাইন আর জার্মান এক্সপ্লোসিভ,' বলে চলেছেন বিল হ্যামারহেড। মারভিন লংফেলোর দিকে তাকালেন একবার।

বিএসএস চীফ ভুরু উঁচু করলেন। 'আইডি?'

হেডসেটে কথা বললেন হ্যামারহেড। 'হোয়াইট ফেস টু ব্ল্যাক

নাইট। ডান দিকে দাঁড়ানো লোকগুলোর ওপর জুম করুন ক্যামেরা, প্লীজ।'

বহু লোককে পাশ কাটিয়ে একজন লোকের মুখে স্থির হলো ক্যামেরা। ভিডিও ইমেজে অস্ত্র ব্যবসায়ী বা সন্ত্রাসীর চেহারা এখন স্পষ্ট। একটা বোতামে চাপ দিলেন হ্যামারহেড, স্ক্রীনের চেহারা দেখে কমপিউটর তার নিজের মেমোরি ঘাঁটছে। আধ সেকেন্ডের মধ্যে কয়েক হাজার চেহারা ফুটল ভিডিও স্ক্রীনে, আলোর একটা ঝলকের মত দেখাল, তারপর স্থির হলো একটা পাসপোর্ট সাইজ ছবি, পাশে তার ডোশিয়ে। তথ্যগুলো দ্রুত বলে গেলেন, 'কার্ল হেকলার। সাবেক পূর্ব জার্মানীর বিফফ টেরোরিস্ট গ্রুপের সদস্য। এখন সে ফ্রিল্যান্সার হিসেবে লেবাননে কাজ করছে।' লোকটার মুখ অস্বাভাবিক লম্বা, গাল দুটো গর্তে বসা, কালো চুল, চোখে সানগ্লাস।

ক্যামেরা আরেকটা মুখের ওপর স্থির হলো। ফেসিয়াল ম্যাচিং প্রোগ্রাম আবার তার খেলা দেখাচ্ছে।

'শিতো ইসাগুরা। রাসায়নিক বিশেষজ্ঞ। টোকিওর সাবওয়েতে হামলার অভিযোগে তাকে খোঁজা হচ্ছে। বর্তমানে কাজ করছে জায়ারেতে, কোনও একটা গেরিলা গ্রুপের সঙ্গে।' ইসাগুরা জাপানী, একহারা গড়ন, শজারুর কাঁটার মত চুল খুলি কামড়ে আছে, ঠোঁটে ফু-মান্‌চু গোঁফ থাকায় চেহারাটা ভয়ঙ্করই লাগে।

ক্যামেরা এবার ফোকাস করল চারজন লোকের ওপর। তারা বাক্স দিয়ে বানানো একটা ডেস্কের চারধারে দাঁড়িয়ে। তিনজন পুব ইউরোপের বাসিন্দা, অপর লোকটা উপমহাদেশীয়- ভারতীয়, পাকিস্তানী বা বাংলাদেশী। তার মুখে ঘন কালো ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি,

ঢোলা আলখেল্লার ওপর ওভারকোট চড়িয়েছে, মাথায় একটা ফেজ টুপি। বয়েস আন্দাজ করা কঠিন, পঁচিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে হতে পারে। অত্যন্ত সুদর্শন চেহারা, দীর্ঘদেহী, নড়াচড়া বা দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে আভিজাত্যের ভাবটুকু স্পষ্ট। বিশাল মনিটর স্ক্রীনে অসহিষ্ণু দেখাল তাকে, ইঙ্গিতে বডিগার্ডদের কাছে ডাকছে। বডিগার্ডরা সসম্ভমে এগিয়ে এসে একটা ব্রীফকেস খুলে বাকি তিনজনকে দেখাল- ভেতরে থরে থরে সাজানো রয়েছে মার্কিন ডলার। ফেসিয়াল ম্যাচিং প্রোগ্রামের বোতামে চাপ দিলেন হ্যামারহেড, লোকটার ডোশিয়ে ফুটে উঠল স্ক্রীনে, পাসপোর্ট সাইজের ছবি সহ।

'খায়রুল কবির। বেশ বেশ বেশ। ইনি অত্যন্ত রহস্যময় এক ব্যক্তি। স্বীকার করতে আপত্তি নেই, ইনিই টেকনোটেরোরিজমের উদ্ভাবক। সন্দেহ করা হয় তাঁর নামের আগে বা পরে চৌধুরী ছিল, কিন্তু টাইটেলটা তিনি বাদ দিয়েছেন পরিচয় গোপন করার স্বার্থে। বিশেষ করে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের ধারণা, ইনি আসলে কুখ্যাত কবির চৌধুরীর পুত্র। অবশ্য স্রেফ সন্দেহই করা হয়, আজ পর্যন্ত কোন প্রমাণ সংগ্রহ করা যায়নি। এফবিআই তাঁকে তিন বছর ধরে খুঁজছে, ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলেতে পাশাপাশি দুটো হোটেল বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়ার অভিযোগে। আমেরিকাতেই লেখাপড়া শিখেছেন। অ্যানার্কিস্ট হিসেবে কাজ করছেন পাঁচ বছর, একবারও ধরা পড়েননি। বর্তমানে নগদ টাকার বিনিময়ে কাজ করেন। আমি তাঁকে ভয় তো পাইই, সমীহও করি, কারণ ভদ্রলোক সত্যি বাপের মতই বিরল একটি প্রতিভা।'

স্ক্রীনে দেখা গেল ব্রীফকেস ভর্তি টাকা দিয়ে চৌকো একটা ছোট লাল বাক্স কিনল খায়রুল কবির। বাক্সটা খুলল সে, কিন্তু ঢাকনির আড়ালে থাকায় লন্ডনের দর্শকরা ভেতরে কি আছে দেখতে পেলেন না। 'এনলার্জ করুন,' নির্দেশ দিলেন বিএসএস চীফ মারভিন লংফেলো। হ্যামারহেডের নির্দেশে সাইটে উপস্থিত ক্যামেরা অপারেটর বাক্সটার ওপর ক্যামেরা জুম করল, আর ঠিক সেই সময় প্রতিপক্ষ একজনের সঙ্গে কথা বলার জন্যে সামান্য একটু পাশ ফিরল খায়রুল কবির, বাক্সটার ভেতর কি আছে সবাই এবার তা দেখতে পেলেন। 'ওহ্ গড!' লংফেলোকে বিস্মিত দেখাল। 'সিআইএ-কে এটার ভিডিও টেপ দেখানো হবে।'

অ্যাডমিরাল রবিনহুড কাঁধ ঝাঁকালেন। এসপিওনাজ সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর কোনই আগ্রহ নেই। পঞ্চান্ন বছর বয়েসে এখনও তাঁর স্বাস্থ্য ফেটে পড়ছে। ধবধবে সাদা প্রকাণ্ড মুখে সব সময় মারমুখো একটা ভাব। কর্তৃত্ব ফলাতে ভালবাসেন তিনি, সবাইকে তা ভুলে থাকতেও দেন না। রুশ জেনারেল জুকোভস্কির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখতে পাচ্ছেন তো, আমাদের তথ্যে কোন ভুল নেই। খাইবার পাসে রাশিয়ান অস্ত্রই বেশি।'

জেনারেল জুকোভস্কির বয়েস ষাট, অত্যন্ত সুদর্শন; তাঁর ইংরেজিও খুব ভাল। 'চোরাই মাল, কয়েক হাত ঘুরে ওখানে পৌঁছেছে। তবে সবই যে আমাদের কাছ থেকে চুরি গেছে, তা নয়। আফগান ওঅরফিল্ডে ওগুলোর বেশিরভাগই আমেরিকানরা দখল করে নেয়, চোরেরা তাদের কাছ থেকে নিয়ে গেছে।'

'বড় একটা যুদ্ধ বা বিপ্লব ঘটাবার জন্যে যথেষ্ট অস্ত্র আর গোলাবারুদ দেখা যাচ্ছে ওখানে,' বুক ফুলিয়ে, সশব্দে, ফুসফুসে

বাতাস ভরলেন অ্যাডমিরাল রবিনহুড। ‘কাজেই প্ল্যান বি শুরু করা যেতে পারে, কি বলেন?’ চোরা বাজারের ওপর হামলা চালাবার সিদ্ধান্ত অনেক আগেই নিয়ে রেখেছেন তিনি। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর কাছ থেকে অনুমতি পেয়েছেন, কাজেই আর কারও সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয়োজন বোধ করছেন না। লাল ফোনটা ধরার জন্যে হাত বাড়িয়ে বিল হ্যামারহেডের দিকে তাকালেন। ‘আপনাদের লোককে কেটে পড়তে বলুন।’

বিএসএস চীফ মারভিন লংফেলো বাধা দিলেন। ‘অ্যাডমিরাল, এটাকে আমি একটা সামরিক সমস্যা বলে স্বীকার করছি, কিন্তু তাই বলে...’

‘হ্যাঁ, সামরিক সমস্যাই, এবং বিশ্বাস করুন...,’ থেমে গেলেন অ্যাডমিরাল, ফোনের রিসিভারে নির্দেশ দিলেন, ‘এইচএমএস চেস্টারফিল্ড...’

হেডসেটে দ্রুত কথা বলছেন বিল হ্যামারহেড, খাইবার পাসে উপস্থিত তাঁদের প্রতিনিধির সঙ্গে, ‘হোয়াইট ফেস টু ব্ল্যাক নাইট, ব্লু কিং প্ল্যান বি শুরু করতে যাচ্ছেন।’

‘...এবং বিশ্বাস করুন,’ আগের অসমাপ্ত কথার খেই ধরে মারভিন লংফেলোকে বললেন অ্যাডমিরাল রবিনহুড, ‘আপনার মত আমিও আশপাশের গ্রামগুলো সম্পর্কে উদ্বিগ্ন। তবে ওগুলো কম করেও দু’মাইল দূরে। আর ক্রুজ মিসাইল এতটা নিখুঁত যে টার্গেটের দুই গজের মধ্যেই আঘাত হানবে।’

‘মি. লংফেলো,’ সকৌতুকে জিজ্ঞেস করলেন রুশ জেনারেল, ‘আপনি কি সন্ত্রাসীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে উদ্বিগ্ন?’

তাঁর দিকে কটমট করে তাকালেন বিএসএস চীফ। ‘আমার

উদ্দেশ্য পরিস্থিতিটা পুরোপুরি বুঝতে পারা। সেজন্যেই অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে যোগ্য একজন স্পাইকে ওখানে পাঠানো হয়েছে।'

ফোনে হুঙ্কার ছাড়লেন অ্যাডমিরাল রবিনহুড, 'ব্লু কিং টু গ্রীন হেলমেট। ফায়ার করার অনুমতি দেয়া হলো।'

প্রায় আড়াই হাজার মাইল দূরে, গালফ অব ওমানে পুরোপুরি সতর্ক অবস্থায় রয়েছে এইচএমএস চেস্টারফিল্ড। এটা একটা ডিউক ক্লাস ফ্রিগেট, টাইপ থ্রী; সঙ্গে আছে আটটা ম্যাকডোনেল ডগলাস হারপুন টু-কোয়াড লঞ্চার, সারফেস-টু-সারফেস মিসাইল ছোঁড়ার জন্যে। সারফেস-টু-এয়ার মিসাইলের জন্যে আলাদা লঞ্চার আছে। ফায়ার করার নির্দেশ পেয়েই ব্রিজ থেকে ইন্টারকমের মাধ্যমে অপারেশনস রূমে মেসেজ পাঠালেন ক্যাপটেন, 'ফায়ার করার প্রস্তুতি নিন। গণনা শুরু হলো- ফাইভ, ফোর, থ্রী, টু...'

ডেকের লঞ্চার ঘুরে গিয়ে পজিশন নিল, পরমুহূর্তে বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে গেল একটা ক্রুজ মিসাইল। 'মিসাইল ছুটছে,' অপারেশন রূম থেকে ইন্টারকমে চিৎকার করলেন ফায়ারিং অফিসার।

লন্ডন, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিচুয়েশন রূম; আলাদা একটা ভিডিও স্ক্রীনে দর্শকরা এখন স্যাটেলাইটের চোখ দিয়ে মিসাইলটার পথ ও অগ্রগতি চাক্ষুষ করছেন। চেস্টারফিল্ডের ইন্টারকমে যা কিছু বলা হচ্ছে তা-ও তাঁরা শুনতে পাচ্ছেন। চেহারা দেখে বোঝা গেল জেনারেল জুকোভস্কি প্রভাবিত হয়েছেন। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়েলেৎসিনের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের

নিজেদের সিচুয়েশন রূমটাকে আরও উন্নত করতে হবে।

'টার্গেটে আঘাত করতে আর বাকি চার মিনিট আট সেকেন্ড,' ফায়ারিং অফিসার রিপোর্ট করলেন। ফ্রিগেট থেকে খাইবার পাসের চোরা বাজারের দূরত্ব কমবেশি আটশো মাইল।

হেডসেটে উত্তেজিত গলায় কথা বলছেন বিল হ্যামারহেড, 'ব্ল্যাক নাইট! চার মিনিট পর সংঘর্ষ! সরে যান, প্লীজ, সাইট ছেড়ে সরে যান!' অপরপ্রান্ত থেকে হেডসেটের মাধ্যমে কিছু একটা শুনতে পেয়ে ভুরু কোঁচকালেন, তারপর চোরা বাজারের ছবি ফুটে থাকা ভিডিও মনিটরের দিকে ঝুঁকলেন- দেখলেন, ডান পাশের মিগটাকে আড়াল করে রেখেছে বাদামী রঙের একটা জীপ। 'হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি জীপটাকে। কিন্তু, না! ওখানে আপনার আর থাকা চলে না! প্লীজ, মি. ...,' ভুলে নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে সামলে নিলেন নিজেকে, '...প্লীজ, ব্ল্যাক নাইট, ফর গড'স সেক, আর এক সেকেন্ডও দেরি করবেন না!'

চীফ অব স্টাফের গলায় জরুরী তাগাদা, লক্ষ করে মনিটরের দিকে ঝুঁকলেন মারভিন লংফেলোও। একটা জীপ সত্যি সত্যি ডানপাশের মিগটাকে আড়াল করে রেখেছে। উপস্থিত বাকি সবাই অপর মনিটরে মিসাইলের যাত্রাপথ অনুসরণ করছেন, দু'ফুট দূরে শুরু হওয়া নতুন নাটকের দিকে কারও খেয়াল নেই।

চেস্টারফিল্ডের ফায়ারিং অফিসার রিপোর্ট করলেন, 'চার মিনিট পর সংঘর্ষ।'

মুখে তৃপ্তির হাসি, বিএসএস চীফের দিকে ফিরলেন অ্যাডমিরাল রবিনহুড। 'সব ভাল যার শেষ ভাল, কি বলেন?'

'শাট আপ!' কর্কশ গলায় ধমক দিলেন মারভিন লংফেলো।

এই ধমক অপ্রত্যাশিত ও অবিশ্বাস্য, অ্যাডমিরাল এতটাই অবাক হলেন যে রাগ করতে ভুলে গেলেন। নিজের অজান্তেই মনিটরের দিকে তাকালেন, বিএসএস চীফের দৃষ্টি অনুসরণ করে।

জীপটা সরে গেল, মিগের ডানাটা মনিটরে এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ফিল্ডে বিএসএস-এর প্রতিনিধি যা দেখতে পাচ্ছে, লন্ডনে বসে এঁরা সবাইও এখন তাই দেখতে পাচ্ছেন। সাইট থেকে বিএসএস প্রতিনিধি কেন সরছে না, সবার কাছেই তা স্পষ্ট হয়ে গেল।

'গুড গড!' মস্ত একটা ঢোক গিললেন অ্যাডমিরাল। 'ওটা কি...?'

সিক্রেট সার্ভিসের চীফ অব স্টাফ জবাব দিলেন, '...একটা সোভিয়েত এসবি-ফাইভ নিউক্লিয়ার টর্পেডো!' ডিভাইসটা মিগের ডানায় ফিট করা রয়েছে।

মারভিন লংফেলো গর্জে উঠলেন, 'মিসাইল ফিরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দিন!'

জেনারেল জুকোভস্কি আতঙ্কে বিড়বিড় করছেন, 'ওহ্ গড, এ কি সর্বনাশ হতে যাচ্ছে!'

হেডসেটে কথা বলছেন হ্যামারহেড, 'জীপটা সরাবার জন্যে ধন্যবাদ, ব্ল্যাক নাইট। গুড ওঅর্ক। কিন্তু আর এক সেকেন্ডও ওখানে থাকবেন না। সরে যান, প্লীজ, সরে যান!'

লাল ফোনটা আবার ছোঁ দিয়ে তুলে নিলেন অ্যাডমিরাল রবিনহুড। 'এইচএমএস চেস্টারফিল্ড, আর্জেন্ট!' জেনারেলের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'মিসাইল আঘাত করলে ওটা কি বিস্ফোরিত হবে?'

জুকোভস্কি কাঁধ ঝাঁকালেন। ‘হতেও পারে। আর যদি না-ও হয়, ওটায় এত বেশি প্লুটোনিয়াম আছে যে চেরনবিলকে পিকনিক মনে হবে। রেডিয়েশন! গোটা পার্বত্য এলাকায় ছড়িয়ে পড়বে! জমাট বরফে, ওয়াটার সাপ্লাইয়ে...’

‘কাছাকাছি গ্রামটার কি হবে?’ জিজ্ঞেস করলেন হ্যামারহেড। ‘ওটা খালি করানো সম্ভব?’

‘তিন মিনিটে?’ জেনারেল জুকোভস্কির চোখ দুটো বিস্ফোরিত হয়ে আছে। ‘দুর্গম পাহাড়ী এলাকায়?’

অ্যাডমিরাল ফোনে চিৎকার করছেন, ‘ব্লু কিং টু গ্রীন হেলমেট- অ্যাবর্ট মিসাইল! অ্যাবর্ট মিসাইল!’

চেস্টারফিল্ডের ব্রিজ থেকে অ্যাডমিরালের নির্দেশ ইন্টারকমে পুনরাবৃত্তি করলেন ক্যাপটেন, ‘অ্যাবর্ট মিসাইল!’

অ্যাবর্ট বাটনে চাপ দিলেন ফায়ারিং অফিসার, কিন্তু কিছুই ঘটল না। ‘স্যার, মিসাইল ধ্বংস করার জন্যে বোতামে চাপ দিয়েছি, কিন্তু ফল পাচ্ছি না- ওটা এরই মধ্যে পার্বত্য এলাকায় পৌঁছে গেছে।’

অকস্মাৎ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিচুয়েশন রূমে অস্থির মৌমাছির মত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন সবাই। শুরু হয়ে গেল চিৎকার-চেঁচামেচি আর ছুটোছুটি। অন্তত দশটা ফোনে কথা বলছেন অফিসাররা।

‘আবার চেষ্টা করুন!’ লাল ফোনে হুঙ্কার ছাড়লেন অ্যাডমিরাল। ‘বারবার চেষ্টা করুন!’

ফিল্ড এজেন্টের সঙ্গে কথা বলছেন হ্যামারহেড, ‘ব্ল্যাক নাইট? আপনি এখনও ট্র্যান্সমিট করছেন কেন?’

মনিটরের চারধারে চরম আতঙ্কের সামরিক সংস্করণ চাক্ষুষ করছেন ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস চীফ মারভিন লংফেলো; সবাই দিশেহারা ও অস্থির, তবু কোথাও এতটুকু বিশৃংলা নেই। তিনি নিজে পুরোপুরি শান্ত, প্রায় অস্বাভাবিকই বলতে হবে। তবে তিনি ও বিল হ্যামারহেড যা জানেন বাকি সবাই তা জানেন না। চীফ অব স্টাফকে ফিসফিস করে বললেন, 'ক্যামেরায় কিন্তু এখন কেউ নেই।'

হ্যামারহেড জবাব দিলেন, 'তাহলে তো খুবই ভাল। তিনি অন্তত ওখানে নেই।'

মাথা নাড়লেন মারভিন লংফেলো। 'ওকে তুমি এতদিনেও চেনোনি? যেখানে আছে বলে মনে করা হয় সেখানে কি কখনও থাকে?'

*

সন্ত্রাসীদের দু'জন গার্ড আগুনের পাশে বসে গা গরম করছে, কোন ধারণাই নেই আর মাত্র দু'মিনিট পর নিশ্চিত মৃত্যু ঘটবে। একজন গার্ড ঠোঁটে সিগারেট গুঁজে সারি সারি নিস্তব্ধ পাহাড়ের দিকে ঘাড় ফেরাল। একটা সোনালি ডানহিল লাইটার উদয় হলো তার মুখের সামনে, সিগারেটের ডগায় আগুন ধরিয়ে দিল। একবার ধোঁয়া টেনে চোখ ফেরাল গার্ড, দেখতে চায় কোন বন্ধু সাহায্যটুকু করল। ভাল করে তাকাবার আগেই প্রচণ্ড এক ঘুসি খেয়ে জ্ঞান হারাল সে। তার হাত থেকে খসে পড়া পিস্তলটা ছোঁ দিয়ে তুলে নিল মাসুদ রানা, সেটা দিয়ে বাড়ি মারল দ্বিতীয় গার্ডের চাঁদিতে।

হাতে সময় কম, দ্রুত ও সহজ পদ্ধতিতে কাজ সারছে রানা,

তা না হলে প্রাণ নিয়ে এই জায়গা ছেড়ে পালাতে পারবে না। এরই মধ্যে একটা প্ল্যান তৈরি করেছে ও, সেটা এখন আর বদলানো সম্ভব নয়। রয়্যাল নেভীর ক্রুজ মিসাইল আসছে, টার্গেট এরিয়া থেকে নিউক্লিয়ার টর্পেডো সহ মিগটাকে সরিয়ে ফেলাই একমাত্র সমাধান; মাসুদ রানার কেতাবে কাপুরুষের মত পালানোর কথা লেখা নেই।

ডানহিল লাইটারটা উল্টো করে লুকানো সুইচে চাপ দিল রানা, খুদে একটা এলসিডি কাউন্টডাউন শুরু করল- ফাইভ, ফোর, থ্রী...

একপাশে পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে রয়েছে তেলের ড্রাম, সেগুলোর পিছনে ছুঁড়ে দিল লাইটারটা, তারপর ঝেড়ে দৌড়। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স হেডকোয়ার্টার ঢাকা থেকে এই 'লাইট গ্রেনেড' নিয়ে এসেছে ও। পাঁচ সেকেন্ড পর ফাটল সেটা, সেই সঙ্গে গোটা বাজার এলাকায় বিস্ফোরিত হলো বিশৃংলা আর হাঙ্গামা।

একটা স্কাড মিসাইল ক্যারিয়ার ওকে পাশ কাটাচ্ছে। চিনতে পেরে সঙ্গত কারণেই দাঁতে দাঁত ঘষল রানা। আট চাকার একটা ট্রাক, ফ্ল্যাটবেডটা লম্বা, তাতে মিসাইলটা আটকানো রয়েছে তেরছা ভঙ্গিতে। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় এক মধ্যবয়স্ক ছাগলদাড়িকে এটা কেনার জন্যে দরদাম করতে দেখা গেছে খানিক আগে। মিসাইল ক্যারিয়ারের ড্রাইভার আগুন দেখে আর দেরি করেনি, নিরাপদ দূরত্বে সরে যাবার চেষ্টা করছে। লাফ দিয়ে ওটায় চড়ল রানা, ঠিক যখন অটোমেটিক রাডারের নির্দেশে গ্যাটলিং গান বিস্ফোরণের দিকে ঘুরে গেল। ওর তৈরি ডাইভারশন

এরিয়ায় ঝাঁক ঝাঁক বুলেট ছুটছে।

রানার পরনে ঢোলা ওভারকোট, মাথায় হ্যাট, গলায় একটা উলেন মাফলার জড়ানো, ফলে হেডসেটটা ঢাকা পড়ে আছে। এতক্ষণ বিল হ্যামারহেডের গলা পেয়েছে, এবার স্বয়ং মারভিন লংফেলোর শান্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, 'যথেষ্ট হয়েছে, মাই বয়; এবার তুমি ওখান থেকে সরে এসো।'

ইতিমধ্যে সবাই ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছে। গার্ডরা ছুটছে ত্রে□তা-বিত্রে□তাদের শান্ত করার জন্যে, আর ত্রে□তা-বিত্রে□তারা অদৃশ্য শত্রুর উদ্দেশে এলোপাতাড়ি গুলি করছে। কেউ কাউকে ভাল করে চেনে না, ফলে ভুল বোঝাবুঝিও শুরু হলো, নিজেরাই নিজেদেরকে গুলি করছে। মহা গোলযোগের মধ্যে কেউ খেয়ালই করল না যে স্কাড মিসাইল ক্যারিয়ার ধরে ঝুলে রয়েছে এক লোক। ক্যারিয়ারটা ওদেরকে পাশ কাটিয়ে দূরে সরে এল।

মোটা টাকা দিয়ে কেনা লাল চৌকো বাক্সটা শক্ত করে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে আছে খায়রুল কবির, নায়কসুলভ সুদর্শন অবয়ব রাগে লালচে হয়ে আছে। চোখে আগুন, বডিগার্ডদের খোঁজে চারদিকে দৃষ্টি বুলাচ্ছে। হতচ্ছাড়ারা গেল কোথায়! ডিভাইসটা হাতে পাবার জন্যে দীর্ঘদিন ধৈর্য ধরতে হয়েছে তাকে, এখন পাবার পর সেটা যদি হারাতে হয়, দুঃখের আর সীমা থাকবে না।

প্যাক থেকে আরেকটা ডিভাইস বের করে স্কাড ক্যারিয়ারের গায়ে চাপড়ে বসিয়ে দিল রানা। ভেহিকেলটা মিগগুলোর কাছাকাছি পৌঁছে গেছে দেখে লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ল, তারপর গড়িয়ে দিল শরীরটা।

কয়েক সেকেন্ড পর বিস্ফোরিত হলো ডিভাইস, স্কাড মিসাইল

থেকে আগুনের উদ্গিরণ শুরু হলো। শিখাগুলো দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, গোটা বাজার ঢেকে ফেলতে খুব বেশি সময় নেবে না।

কবিরের দু'জন বডিগার্ড লাফ দিয়ে একটা জীপে চড়ল, কিল-ঘুসি মেরে নিচে ফেলে দিল ড্রাইভার আর প্যাসেঞ্জারকে। জীপ ঘুরিয়ে মনিবের কাছে চলে এল তারা। জীপে চড়ল কবির, চিৎকার করছে, 'গেট দ্য হেল আউট অব হিয়ার!' তার দু'জন বডিগার্ডই আমেরিকান। সমস্ত হৈ-চৈ হাঙ্গামা পিছনে ফেলে রাস্তার দিকে ছুটল জীপ।

রয়্যাল নেভীর মিসাইল পৌঁছুতে আর সম্ভবত দুই মিনিট বাকি, গড়ান দিয়ে কাছাকাছি মিগটার তলায় চলে এল রানা, ওটার ডানাতেই নিউক্লিয়ার উইপন রয়েছে। এয়ারত্র□াফটের নিচে দাঁড়িয়ে কয়েকটা বুলেট হোল পরীক্ষা করছিল পাইলট, ঘাড় ফেরাতে এক মুহূর্ত দেরি করে ফেলল। তার পা ধরে হ্যাঁচকা টান দিল রানা। লোকটা পড়ে যেতে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে লাথি মারল মাথায়। চিন্তার জন্যে না থেমে পাইলটের হেলমেটটা হাতে নিয়ে ককপিটে উঠল। ওর পিছনে নিজের সীটে বসা কো-পাইলট চেঁচিয়ে উঠল, পিস্তল বের করে গুলি করতে যাচ্ছে। ঘুরে এক ঘুসিতে লোকটার নাক চ্যাপ্টা করে দিল রানা, তারপর হাতের হেলমেট দিয়ে মাথায় বাড়ি মারল। সীটের ওপর জ্ঞান হারাল কো-পাইলট।

মাথায় হেলমেট পরে কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে তাকাল রানা, মিগ-টোয়েনটি নাইনের সঙ্গে পরিচয়টা ঝালাই করে নিচ্ছে। মিগ চালিয়েছে ও, তবে বহুকাল আগে। মাত্র দশ সেকেন্ডের মধ্যে সব মনে পড়ে গেল। মিগ-টোয়েনটি নাইনের রেঞ্জ সাতশো পনেরো

মাইল, গ্রাউন্ড টার্গেটে আঘাত করার জন্যে একই সঙ্গে বহন করতে পারে মিসাইল, রকেট ও বোমার পুরো লোড। ডানার একটা শক্তিশালী কামান ফিউজিলাজের সঙ্গে মিশে গেছে। আরও আছে বিশেষ ধরনের রাডার, এঞ্জিনিয়াররা যেটাকে 'লুক-ডাউনঢ়শূট-ডাউন' বলে- ওটা থাকায় লো-ফ্লাইং এয়ারত্রাফট বা মিসাইলকে সনাক্ত ও আঘাত করা যায়। ঘণ্টায় এক হাজার চারশো পঞ্চাশ মাইল গতি, মাত্র এক মিনিটের মধ্যে আকাশের পঞ্চাশ হাজার ফুট ওপরে উঠে যেতে পারে। রানা আশা করল, এই স্ট্যাটিস্টিক্স যেন নির্ভুল হয়। এঞ্জিন ফায়ার করল ও, জোড়া ক্যানাপি বন্ধ করার জন্যে চাপ দিল বোতামে।

প্রায় পঞ্চাশ ফুট দূর থেকে দ্বিতীয় মিগের পাইলট দৃশ্যটা হাঁ করে গিলছে। চোখের ভুল নয়, এক লোক সত্যি সত্যি একটা মিগ চুরি করছে! এ তো দেখা যাচ্ছে ভারি মজা...

দ্বিতীয় মিগের এঞ্জিন জ্যান্ত হয়ে উঠল।

মিগটাকে গড়িয়ে এয়ারস্ট্রিপের দিকে নিয়ে যাচ্ছে রানা, এরইমধ্যে সন্ত্রাসীদের কয়েকজন টের পেয়ে গেল আসলে কি ঘটছে। মিগ লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে তারা। কেউ কেউ জীপে চড়ে ছুটে আসছে।

প্লেনটাকে এক চক্কর ঘোরাল রানা, এঞ্জিন থেকে বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে আসা বাতাস ঝাড়ু দেয়ার ভঙ্গিতে দূরে সরিয়ে দিল জীপ আর সন্ত্রাসীদের। এরপর ডানার নিচে গানগুলো কাজে লাগাল, আগুন ধরিয়ে দিল বিস্ফোরক আর রকেটের কয়েকটা স্ত ূপে। খাড়া ও আকাশ ছোঁয়া শিখার পাঁচিল তৈরি হলো, রানওয়েতে পৌঁছুনো পর্যন্ত ওদেরকে দূরে সরিয়ে রাখবে।

প্লেন ঘুরিয়ে নিয়ে আবার রানওয়ের দিকে ফুল স্পীড ছুটল রানা, চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল একবার, ধারণা করছে যে-কোন মুহূর্তে মিসাইলটাকে দেখতে পাবে।

রানা তাকিয়ে আছে, সামনের মেঘ ভেদ করে উদয় হলো ত্র□ুজ মিসাইল, সরাসরি ওকে লক্ষ্য করে ছুটে আসছে। এই মুহূর্তে সময়ের হিসাবে সূক্ষ্ম কোন ভুল হলেও মৃত্যু নিশ্চিত। থ্রটল টেনে ধরেছে রানা- মিসাইলটা সরাসরি ওর ওপর দিয়ে ছুটে গেল; বলা যায় মাথার চুল দু'ভাগ করে- পরক্ষণেই কন্ট্রোল কলাম ঠেলে দিল সামনে। মিগের চাকা শূন্যে উঠল, একই সময়ে ওটার পিছনে বিস্ফোরিত হলো মিসাইল, দ্বিতীয় মিগটা চোখের পলকে অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হলো।

সিচুয়েশন রূমে গত দুই মিনিট কেউ কোন কথা বলছেন না, ঘরের ভেতর টান টান উত্তেজনা, দম বন্ধ করে মনিটরের দিকে তাকিয়ে আছেন সবাই। সাইট থেকে ক্যামেরা সরেনি, তবে ফ্রেম থেকে সরে গেছে মিগটা। মিগের ডানায় ফিট করা নিউক্লিয়ার টর্পেডো দেখতে না পাওয়ায় ব্রিটেনের সামরিক ও ইন্টেলিজেন্স অফিসাররা কেউ কেউ প্রমাদ গুনছেন, আবার কেউ কেউ প্রার্থনা করছেন। সংঘর্ষের নির্দিষ্ট সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে, ফায়ারিং অফিসার সেকেন্ড গুনছেন। তারপর তাঁরা দেখলেন মনিটরের সম্পূর্ণ দৃশ্যই সহস্র টুকরোয় বিস্ফোরিত হলো। সমস্ত স্ক্রীনের ইমেজ হয়ে দাঁড়াল ভিডিও স্নো।

ওদিকে ত্র□ুজ মিসাইলের সংঘর্ষ মাটির বুকে নরক তৈরি করেছে। অস্থির একটা বিশাল অগ্নিগোলক ল্যান্ডিং স্ট্রিপের ওপর গম্বুজের আকৃতি নিচ্ছে, রানার মিগটাকে গ্রাস করে ফেলবে। থ্রটল

ঠেলে দিয়ে দ্রুত ওপরে, আরও ওপরে উঠে যাচ্ছে রানা, আতঙ্কে নীল হয়ে গেছে মুখ। অবশেষে কমলা রঙের গম্বুজের আঁচ আর ধোঁয়ার নাগাল থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল মিগ পরিচ্ছন্ন আকাশে।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল, চোখ বুজে সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করল রানা। পেরেছে ও, সোভিয়েত টর্পেডো সরিয়ে আনতে পেরেছে। মনে মনে গাল দিল অ্যাডমিরালকে, ব্যাটা উজবুক! এখন প্রশ্ন হলো, যায় কোথায়? এইচএমএস চেস্টারফিল্ড বহু দূরের পথ, কাজেই ওদিকে যাবার প্রশ্ন ওঠে না। ছাগলদাড়ির চেহারাটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। আশা করা যায় খাইবার পাসে পটল তুলেছে লোকটা। তবে পেশোয়ারে তার একজন সঙ্গীর অপেক্ষা করার কথা, অবৈধ অস্ত্রের চালান নিয়ে বাংলাদেশে ঢোকার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এখন পেশোয়ারে গিয়ে ওই লোককে যদি পাকড়াও করা যায়, ওর অ্যাসাইনমেন্ট পুরোপুরি সফল বলে গণ্য করা হবে।

দীর্ঘ বহু বছরের ত্যাগ, সাধনা ও নিষ্ঠার কল্যাণে সম্ভাবনাময় বাঙালী জাতির অন্যতম গৌরবে পরিণত হয়েছে একটি প্রতিষ্ঠান- মাসুদ রানা। বুকে সৎ সাহস লালন আর দেশের জন্যে প্রয়োজনে আত্মবিসর্জন দেয়ার সঙ্কল্প ওকে মহত্ত্ব দান করেছে। বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স একটা নিষ্প্রাণ কাঠামো মাত্র, প্রেরণাদাতা প্রাণ-পুরুষ বলতে বোঝায় মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানকে, আর তাঁর নিজের হাতে গড়া মাসুদ রানা হলো ঘনঘোর অন্ধকারে আশার একটা আলো, অক্লান্ত এক বীর যোদ্ধা। একাই একটা প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে, এরকম স্পাই বিসিআই-তে আরও কয়েকজন আছে, এই অভাগা জাতি তাদেরকে নিয়েও কম গর্বিত নয়। তবে মাসুদ রানার সঙ্গে বোধহয় কারুরই কোন তুলনা চলে

না।

বেশ কিছুদিন থেকে গুজব শোনা যাচ্ছিল বিদেশ থেকে চোরা পথে চট্টগ্রামে প্রচুর অবৈধ অস্ত্র আসছে। এক শ্রেণীর মৌলবাদী ফ্যানাটিক দেশের স্থিতিশীলতা নষ্ট করার জন্যে বিদেশী শত্রুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চায়, বিপুল পরিমাণ অস্ত্র এনে ক্যাডারদের মধ্যে বিলি করাই তাদের উদ্দেশ্য। গুজবের সত্যতা জানার জন্যে ইন্টারপোলের সাহায্য প্রার্থনা করে বিসিআই। এক মাস তদন্ত করার পর ইন্টারপোল রিপোর্ট করে, গুজব মিথ্যে নয়, কুখ্যাত এক রাজাকার পরিবার অবৈধ অস্ত্রের ব্যবসা শুরু করেছে, সরাসরি খাইবার পাস থেকে অস্ত্র কিনে আনছে তারা। বিসিআই হেডকোয়ার্টারে ডাক পড়ল মাসুদ রানার, অপরাধীদের নির্মূল করার দায়িত্ব দেয়া হলো ওকে।

ঠিক ওই সময় ব্রিটিশ সিক্রে□ট সার্ভিসও ইন্টারপোলে খোঁজ-খবর নিচ্ছিল, জানতে চাইছিল আন্ডারগ্রাউন্ডে যে বিপুল পরিমাণ অবৈধ অস্ত্র আসছে তার উৎসটা কোথায়। তাদেরকে ইন্টারপোল জানাল, উৎস হলো পাক-আফগান সীমান্ত, অর্থাৎ খাইবার পাস। এই তথ্য পাবার পর ব্রিটিশ সিক্রে□ট সার্ভিস খাইবার পাসের চোরাই অস্ত্রের বাজার ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেয়, তা না হলে আন্ত র্জাতিক সন্ত্রাসীদের সঙ্গে পারা যাবে না। পাক ও আফগান সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে তারা। দুই সরকারই ইতিবাচক সাড়া দিতে দেরি করেনি। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল ফিল্ডে কাকে পাঠানো হবে তাই নিয়ে। এজেন্টকে পশতু, পাঞ্জাবী আর উর্দু ভাষায় দক্ষ হতে হবে, তার চেহারাটাও হওয়া চাই স্থানীয় লোকজনদের মত, তা না হলে ধরা পড়ে যাবার আশঙ্কা থাকে।

সমাধানের পথ দেখাল ইন্টারপোল। তারা জানাল, বিসিআই মাসুদ রানাকে খাইবার পাসে পাঠাচ্ছে। বিএসএস চীফ মারভিন লংফেলো ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন, কথা বললেন সরাসরি জেনারেল রাহাত খানের সঙ্গে। এক ঢিলে দুই পাখি মারা যাবে, কাজেই বিএসএস চীফের অনুরোধ রক্ষা করতে রাজি হলেন বিসিআই চীফ। ঠিক হলো খাইবার পাসে রানা ব্রিটিশদেরও প্রতিনিধিত্ব করবে।

এই মুহূর্তে ব্রিটিশ সিচুয়েশন রূমে হাসছেন সবাই। হেডসেট থেকে টেনে একটা প্লাগ খুলে ফেলেছেন মারভিন লংফেলো, ফলে রানার গলা উপস্থিত সবাই শুনতে পাচ্ছেন। রানা বলছে, 'কো-পাইলটকে নিয়ে পেশোয়ারে ল্যান্ড করতে যাচ্ছি আমি। মি. লংফেলো, কি ঘটেছে সবই আপনারা দেখেছেন। আশা করি বাজারটা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। তার মানে আমার কাজ শেষ।'

'আমরা সবাই তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ, মাই বয়,' লংফেলো বললেন। 'তুমি সম্ভবত শতাব্দীর সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা থেকে দুনিয়াকে বাঁচিয়েছ। নিউক্লিয়ার ডিভাইসটা বিস্ফোরিত হলে কয়েক লাখ মানুষের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ত। অ্যাডমিরাল রবিনহুড বলছেন তোমার প্রতি তিনি চিরঋণী হয়ে থাকবেন...'

'তাঁর প্রতি আমার একটাই অনুরোধ, নামটা পাল্টাতে বলুন। রবিনহুড একটা আদর্শের নাম, ব্যক্তিবিশেষ ব্যবহার করলে সেটার অমর্যাদা করা হয়।'

চোখ-মুখ গরম আর লাল হয়ে উঠলেও, অপমানটা নীরবে হজম করলেন অ্যাডমিরাল।

লংফেলো বললেন, ‘তোমার কাজ শেষ, এ-কথা বোধহয় ঠিক নয়। ওখানে খায়রুল কবিরকে দেখা গেছে। তার হাতে কি ছিল তুমি দেখেছ।’

‘হ্যাঁ, দেখেছি। কবির সম্ভবত বড় ধরনের কোন অপরাধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।’

‘ওকে শায়েস্তা করার প্রয়োজনে তোমার সাহায্য দরকার হলে পাব তো?’ জানতে চাইলেন বিএসএস চীফ।

‘হ্যাঁ, অবশ্যই।’

দুই

পৃথিবীর চারধারের মহাশূন্য অসংখ্য স্যাটেলাইটে বোঝাই হয়ে আছে, গোলকটাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে সবগুলো, প্রতিটি আলাদা কর্ম সম্পাদন ও দায়িত্ব পালন করছে। ওগুলোকে মোটামুটি পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়- কমিউনিকেশনস স্যাটেলাইট, নেভিগেশনাল এইডস স্যাটেলাইট, ইন্টেলিজেন্স-গ্যাদারিং স্যাটেলাইট, মিলিটারি রিকনাইসন্স স্যাটেলাইট আর ওয়েদার স্যাটেলাইট। প্রতিটি স্যাটেলাইটের মালিক নির্দিষ্ট কোন রাষ্ট্র, তবে কিছু কিছু করপোরেশনেরও নিজস্ব স্যাটেলাইট আছে- এ-সব করপোরেশন নানা দিক থেকে একটা রাষ্ট্রের চেয়েও বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে।

দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সমস্ত খবর প্রচার নির্ভর করে কমিউনিকেশন স্যাটেলাইটের ওপর, ওগুলো ছাড়া আধুনিক সভ্যতা পঙ্গু হয়ে পড়বে। সারা দুনিয়া জুড়ে টেলিফোন, রেডিও আর টেলিভিশন লিঙ্ক-আপ করা সম্ভব হচ্ছে এই কমিউনিকেশন স্যাটেলাইটের কল্যাণেই। পঞ্চাশ আর ষাটের দশকে প্রথম এক

ঝাঁক স্যাটেলাইট মহাশূন্যে পাঠানো হয়, তখন থেকে যাত্রা শুরু করে ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন স্যাটেলাইট অর্গানাইজেশন অনেক কঠিন পথ পাড়ি দিয়েছে, আজ তারা গোটা দুনিয়ার মানুষকে কাছাকাছি নিয়ে আসতে পারার গর্বে গর্বিত। স্যাটেলাইট না থাকলে টেলিভিশনে গালফ ওঅর সরাসরি দেখা যেত না, দেখা যেত না বিশ্বকাপের লাইভ খেলাগুলো, গতকালের খবর গতকালের খবর হিসেবেই পরিবেশিত হত।

গত ত্রিশ বছরে কমিউনিকেশন টেকনোলজির উন্নতি দুনিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতিও বদলে দিয়েছে। স্যাটেলাইটের কল্যাণে এক দেশের লোক আরেক দেশের শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কে খুঁটিনাটি সব কিছু জানতে পারছে। সমস্ত পাঁচিল ভেঙে পড়েছে, অপসারিত হয়েছে কঠিন সব বাধা। স্যাটেলাইট না থাকলে এখনও অন্য কোন দেশের সামরিক শক্তিকে ভয় পেত মানুষ, সেই দেশের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংশয়ে ভুগত।

এ-ধরনের বেশ কিছু কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট রয়েছে এফএমজিএন-এর হাতে। এফএমজিএন মানে হলো ফাউলার মিডিয়া গ্রুপ নেটওঅর্ক। এফএমজিএন দুনিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম নিউজ অর্গানাইজেশন, সিএনএন-কে যদি প্রথম ধরা হয়। দুনিয়ার শিক্ষিত প্রায় সব মানুষই এফএমজিএন সম্পর্কে জানে, কারণ অন্য যে-কোন নেটওঅর্কের চেয়ে দ্রুত খবর পরিবেশন করতে পারে তারা। তাদের জনপ্রিয় শ্লোগান হলো, 'কালকের আগাম খবর'। দুনিয়ার এমন কোন প্রান্ত নেই যেখানে এফএমজিএন উপস্থিত নয়। এমন কি, পশ্চিমা জগৎকে ভাল চোখে দেখে না এমন মানুষও এফএমজিএন ক্যামেরা দেখতে পেলে হাসি মুখে

ছুটে আসে।

এই মুহূর্তে এফএমজিএন-এর একটা কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মাথায় রয়েছে, অবলোকন করছে চীন উপকূলে জমে ওঠা একটা নাটক।

দক্ষিণ চীন সাগরের মাথায় মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে চাঁদ, ম্লান জোছনা আর গাঢ় ছায়ায় ভৌতিক একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছে, ফলে প্রতিটি জিনিস থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে তার নিজস্ব রঙ।

এইচএমএস নটিংহাম হলো টাইপ টোয়েনটি থ্রী ডিউক ক্লাস ফ্রিগেট, রুটিন পেট্রলে বেরিয়ে ফিলিপাইন থেকে হঙকঙ যাচ্ছে, এই সময় এক জোড়া চীনা মিগ-টোয়েনটিওয়ান জাহাজটার ওপর দিয়ে উড়ে গেল, অ্যান্টেনা আর মাস্তুল প্রায় ছুঁয়ে দিয়ে। উস্কানিমূলক আচরণ, সন্দেহ নেই। আন্তর্জাতিক আইনের সুস্পষ্ট লদঘন। তারচেয়েও বিস্ময়কর ও হতবুদ্ধিকর হয়ে উঠল চীনাদের কথাবার্তা। তারা বলছে, এইচএমএস নটিংহাম নাকি চীনা জলসীমার ভেতরে রয়েছে।

নটিংহামের ক্যাপটেন কমান্ডার জন ফার্মোস ঝড়ের বেগে ব্রিজে ঢুকলেন। ফার্স্ট অফিসার লেফটেন্যান্ট কমান্ডার নাথান মস বলে উঠলেন, 'স্যার, ওরা কি পাগল হয়েছে? বলে কিনা আমরা নাকি চীনা জলসীমায় রয়েছি!'

'অসম্ভব, তা কি করে হয়! চীনা সমুদ্রসীমা থেকে অনেক দূরে রয়েছি আমরা। শয়তানি করলে আলাদা কথা, তা না হলে হিসাবে কোথাও ভুল করছে ওরা।'

সাগরে চলাচল করছে এমন সব জাহাজকে দিক নির্দেশনা দেয় আরেক ধরনের স্যাটেলাইট। বছর দুই আগে গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম সহ মহাশূন্যে পাঠানো এক ঝাঁক এনএভিএসটিএআর স্যাটেলাইট সময় আর অবস্থান জানিয়ে মেসেজ প্রচার করছে বিরতিহীন। পৃথিবীর চারপাশে এ ধরনের বাইশটা স্যাটেলাইট কাজ করছে, এবং পজিশন সম্পর্কে ওগুলোর দেয়া হিসাব সামরিক ক্ষেত্রে মাত্র কয়েক ফুট এদিক-ওদিক হতে পারে, বেসামরিক ক্ষেত্রে তিনশো ফুটের বেশি নয়। জাহাজের ম্যাপে নটিংহামের যে পজিশন দেখা যাচ্ছে তা এনএভিএসটিএআর স্যাটেলাইট সিগনাল থেকে পাওয়া, কাজেই ভুল হবার কোন কারণই নেই।

হেলমসম্যান চীনাদের আরও একটা মেসেজ ধরিয়ে দিল ক্যাপটেন জন ফার্মোসের হাতে। মেসেজটা পড়ে মুখ তুললেন তিনি। 'ওরা দেখছি সত্যি পাগল হয়ে গেছে! বলছে ওদের সঙ্গে কাছাকাছি চীনা বন্দরে যেতে হবে, তা না হলে আমরা যেন যে-কোন পরিস্থিতির জন্যে তৈরি থাকি!'

ফার্স্ট অফিসার নাথান মস একটা বোতামে চাপ দিলেন, গোটা জাহাজে সতর্ক-ঘণ্টা বেজে উঠল। 'অ্যাকশন স্টেশনস, স্যার,' ক্যাপটেনকে রিপোর্ট করলেন তিনি।

ইন্টারকমে রেডিও অপারেটরকে নির্দেশ দিলেন ক্যাপটেন ফার্মোস, 'চীনা কর্তৃপক্ষকে জানাও, "এটা ব্রিটিশ ফ্রিগেট নটিংহাম। আপনারা যে পজিশনের কথা উল্লেখ করছেন আমরা সেখানে নেই। আপনাদের উপকূল থেকে পঁচাত্তর মাইল দূরে, আন্তর্জাতিক জল-সীমায় রয়েছি আমরা। আমরা কোন চাইনীজ

বন্দরে যাব না। আপনারা আন্তর্জাতিক আইন লদঘন করছেন'' ।'

'ইয়েস, স্যার।'

ফোন তুলে অপারেশনস রূমের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন ক্যাপটেন। 'আমাদের পজিশন সম্পর্কে আমরা পুরোপুরি নিশ্চিত তো?'

প্রিন্সিপাল ওঅরফেয়ার অফিসার একটা ডিসপ্লে চেক করলেন। তাতে ওয়াইড, মিডিয়াম আর ক্লোজ-আপে, অর্থাৎ তিনভাবে স্যাটেলাইট ফিক্স দেখানো হয়েছে। 'ইয়েস, স্যার,' জবাব দিলেন তিনি। 'স্যাটেলাইট ফিক্সে কোন গলদ নেই।'

ফার্মোস বিড়বিড় করছেন, 'স্পর্ধা বলিহারি! চীনা পোর্টে যেতে হবে, হুহ্! হঙকঙ ফিরে পাবার পর নিজেদেরকে এই এলাকার মালিক মনে করছে ওরা।' অত্যন্ত শক্ত ধাতুতে গড়া মানুষ তিনি, অন্যায়ের কাছে নতি স্বীকার করা তাঁর স্বভাব নয়।

কিন্তু চীনা মিগ দুটো আবার নটিংহামের ওপর দিয়ে উড়ে গেল। পাইলটরা তাদের বেস থেকে নির্দেশ পাচ্ছে। তারা ভাবছে, ব্রিটিশরা তো তাদের অভিযোগ অস্বীকার করবেই- চীনা জলসীমায় চুপিচুপি ঢুকে ধরা পড়ে গেছে যে! কোন সন্দেহ নেই নটিংহাম স্পাই মিশন নিয়ে এসেছে।

নটিংহামের ব্রিজে হেলমসম্যান ক্যাপটেনকে জানাল, 'স্যার, চীনা সিগন্যাল বলছে, ওদের পাইলটরা নিশ্চিত হয়েই রিপোর্ট করছে যে আমরা চীন উপকূল থেকে মাত্র এগারো মাইল দূরে রয়েছি, ওদের জলসীমার ভেতর; এবং জাহাজ ঘুরিয়ে নিয়ে আমরা যদি কাছাকাছি একটা চীনা বন্দরে না ভিড়ি, ওরা গুলি করতে বাধ্য হবে।'

পুরোপুরি হতাশ ক্যাপটেন ফার্মোস বললেন, ‘মেসেজ পাঠান- “আমরা আন্তর্জাতিক জলসীমায় রয়েছি, আত্র□ান্ত হলে নিজেদেরকে রক্ষা করব”। সমস্ত সিগনালের কপি পাঠান অ্যাডমিরাল্টিতে। আর্জেন্ট।’

ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ ফুল স্পীডে ছুটছে, কেউ লক্ষ করল না গাঢ় ছায়া রঙের একটা অদ্ভুত আকৃতি অনুসরণ করছে ওটাকে। অবশ্য সচেতন করা হলেও কেউ ওটাকে দেখতে পেত না, কারণ সর্বশেষ টেকনলজির বদৌলতে এই জলযান রেডারে ধরা পড়বে না। একজোড়া খোল, বিশাল পনটুন আর মসৃণ তল রয়েছে ওটার, প্রতিটি ইঞ্চি কালো রঙ করা; দেখে মনে হবে সাগরের গহীন থেকে উঠে আসা কোন আজব প্রাণী, সুযোগের অপেক্ষায় ওত পেতে আছে, ইচ্ছে হলেই হামলা করে বসবে। জলযানটার ভারী শরীর পানির খুব কাছাকাছি ঝুলে আছে একজোড়া পনটুনের ওপর ভর দিয়ে। দুই পনটুনের মাঝখানে ফাঁক রয়েছে, ফাঁকের মাথায় ছাদ বলা যায় জাহাজের তলাটাকে, ছোট আকারের জলযান ভেতরে ঢুকতে বা ভেতর থেকে বেরুতে পারবে অনায়াসে।

আকারে বিশাল হলেও, খুব বেশি উঁচু না হওয়ায় শত্রুপক্ষের রেডারে ওটার ধরা পড়ার আশঙ্কা এমনিতেও কম, তার ওপর সারফেস বা বাইরের আবরণ রেডার-ওপেক পদার্থ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, তার ওপর গোটা জলযানের গায়ে রেডার-অ্যাবজরবিং ম্যাটিরিয়াল-এর প্রলেপ দেয়া হয়েছে। জাহাজের খোলে কোন ফাঁক বা ফাটল না থাকলে হাই-ফ্রিকোয়েন্সী রেডিও পালস গায়ে লাগলেও তা ফেরত যাবে না।

জাহাজটার ঝুলন্ত শরীরের নিচে, দুই পনটুনের মাঝখানের

ফাঁকে, একটা দরজা খুলে গেল। দোরগোড়া থেকে পানিতে নামানো হলো একটা ডিভাইস, নাম দেয়া হয়েছে 'উঁকি'। পানিতে ডুব দেয়ার পর ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ নটিংহামের দিকে দ্রুত এগোল উঁকি। আকারে জেট এঞ্জিনের মত, ওটা একটা ড্রিলিং মেশিন; দাঁত হিসেবে আছে এক সেট চকচকে রোটারি কাটার, আর চোখ হিসেবে আছে ভিডিও ক্যামেরা। কাটারগুলো তিনটে ইন্টারলকিং হেড, গিয়ার পদ্ধতিতে কাজ করে। পিছন দিকে ডাইরেকশনাল নজল থেকে পানি বেরুচ্ছে, ওগুলোকে সচল রেখেছে মেশিনটার মাঝখানে বসানো টারবাইন। আধুনিক টর্পেডোর মত প্রোবিং মেশিনও ওয়ায়্যার-গাইডেড। যে-কোন জলযান ভেদ করে ভেতরের ছবি পাঠানোই ওটার কাজ। খায়রুল কবির, একজন বাঙালী, ওটার উদ্ভাবক, সেজন্যেই নামটাও দেয়া হয়েছে বাংলা।

মাদারশিপে বসে একজন জার্মান, ডিক মেনাচিম, উঁকিকে জ্যান্ত হয়ে উঠতে দেখল মনিটরে। ব্রিটিশ জাহাজের দিকে এগোচ্ছে উঁকি, পিছনে কুণ্ডলী ছাড়াচ্ছে তার। সব কিছু ঠিকঠাক মত চলছে, কাজেই মেনাচিম খুব খুশি। এই কাজটায় যদি সফলতা আসে, মোটা বোনাস পাওনা হবে তার, সঙ্গে জুটবে এমন একটা সাবজেক্ট, যে সাবজেক্টকে নিয়ে আরও একটা কুখ্যাত ভিডিও ফিল্ম তৈরি করতে পারবে সে। তার এই ভিডিওটেপগুলো বস্ খুব পছন্দ করেন। ভিয়েৎনামী মেয়েটাকে নিয়ে সর্বশেষ যেটা বানিয়েছে সেটাকে ক্লাসিক বলতে হবে। ভায়োলেন্ট পর্ণোগ্রাফীর স্তরে পড়ে যায়, তাই ওগুলো বাজারজাত করা যায় না, সেজন্যে দুঃখের সীমা নেই মেনাচিমের। ভিডিওতে যা-ই সে রেকর্ড করে, শেষ দিকটা কিভাবে যেন বড় বেশি বীভৎস হয়ে ওঠে।

পঁয়ত্রিশ বছর বয়েস তার, দেখতে সুন্দর ও সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী হলেও চেহারায় ভারসাম্যহীন কি যেন একটা আছে; বিশেষ করে অন্তর্ভেদী নীল চোখ থেকে বিচ্ছুরিত চকচকে একটা ভাব ইঙ্গিত দেয় তার মাথার অন্তত একটা স্ক্রু নিশ্চয়ই ঢিলে।

মেনাচিম ভাবছে, বসকে বলে মাদারশিপ সী ঈল-এর ক্যাপটেনকে বদলাতে হবে। লোকটা বড় বেশি নার্ভাস। ভয়-ডরহীন আত্মবিশ্বাসী লোক পছন্দ করে সে। কন্ট্রোল থেকে বারবার ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাচ্ছে ক্যাপটেন, সম্ভবত ভয় পাচ্ছে ভুল-ভাল করলে মেনাচিম তার মাথার পিছনে গুলি করবে। সে অবশ্য জানে যে সবাই তাকে ভয় পায়। ত্রুদের মধ্যে চীনা, জার্মান আর ভিয়েৎনামীরা আছে, তার প্রতিটি নির্দেশ তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে।

নিষ্ঠুর বলে কুখ্যাতি থাকায় মেনাচিম নিজের ওপর খুশি। এই কুখ্যাতি অর্জন করার জন্যে তাকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। এক বন্ধুকে টুকরো টুকরো করে কাটার অভিযোগে প্রথমে তার আট বছরের জেল হয়। প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী না থাকায় সেবার মৃত্যুদণ্ড থেকে বেঁচে যায় সে। জেলে থাকতেই একটা রেপ কেসে আরও বিশ বছরের জেল দেয়া হয় তাকে। বস্ কৌশলে ছাড়িয়ে না আনলে আজও ঘানি টানতে হত। মুক্তি পাবার পরও নিজেকে সংশোধন করেনি সে। মারপিট করতে এখনও তার ভাল লাগে। শুধু ব্যথা দিতে নয়, পেতেও ভালবাসে সে; ব্যথা তার কাছে কষ্টকর নয়, আনন্দময় অভিজ্ঞতা।

নটিংহামের অপারেশনস রূমে লোকজন ছুটোছুটি শুরু করেছে। প্রোবিং মেশিন উঁকিকে তারা রেডারে দেখতে পেয়েছে

ঠিকই, কিন্তু চিনতে ভুল করছে। 'স্যার!' কামরার ভেতর কমান্ডার ফার্মোস আর লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মস ঢুকতেই চেঁচিয়ে উঠল লিডিং সীম্যান। 'টর্পেডো বেয়ারিং ওয়ান ওয়ান ফোর, রেঞ্জ এইট-থাউজেন্ড।'

ফার্মোস সাড়া দিলেন, 'অলটার টু ওয়ান ওয়ান ফোর।'

হতভম্ব পিডব্লিউও রেডারে তাকিয়ে আছে। 'সারফেসে কিছুই নেই, স্যার।' কথাটা সত্যি, জাহাজটার কয়েক মাইলের মধ্যে কিছু নেই, অন্তত স্ক্যানার একদম খালি।

মস বললেন, 'নিশ্চয়ই মিগগুলো ওটাকে ফেলে গেছে।'

নটিংহাম তীক্ষ্ণ একটা বাঁক নিল, বাঁক ঘুরে প্রোবিং মেশিন উঁকিও পিছু নিল আবার। দ্রুত কাছে চলে আসছে ওটা।

লিডিং সীম্যান রিপোর্ট করল, 'টর্পেডোও আমাদের সঙ্গে কোর্স বদল করেছে!'

পিডব্লিউও চেঁচিয়ে উঠল, 'সংঘর্ষের জন্যে তৈরি হন!'

দম বন্ধ করল সবাই।

উঁকির প্রচণ্ড গুঁতো খেয়ে গোটা নটিংহাম কেঁপে উঠল। নিচের জেনারেটর রূমে এঞ্জিনিয়াররা ছিটকে পড়লেন মেঝেতে। ওপর দিকে তাকিয়ে একদিকের দেয়াল কাঁপতে দেখলেন তাঁরা। সেখানে একটা বৃত্ত তৈরি হলো, বৃত্তের মাঝখান থেকে বাষ্প বেরুচ্ছে। পরমুহূর্তে ভেতরে ঢুকল উঁকি, বিস্ফোরিত বিপুল জলরাশি নিয়ে।

মেইন পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ হয়ে গেল, জ্বলে উঠল ইমার্জেন্সী লাইট। মস রিপোর্ট করলেন, 'জেনারেটরগুলো ডুবে গেছে, স্যার। সি-ডেকে পানি ঢুকছে।'

'আমাদের স্টার্নও ডুবে গেছে, স্যার,' যোগ করল লিডিং সীম্যান।

পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্যে গোটা জাহাজ জ্যান্ত হয়ে উঠল। নাবিকরা মেস রূম থেকে ইকুইপমেন্ট বের করছে, বাকি সবাই ছুটছে অ্যাকশন স্টেশনে। তবে এরপর মেস রূমই অদৃশ্য হয়ে গেল, কারণ প্রোবিং মেশিন উঁকি মেঝে ফুঁড়ে উঠে এল ওপরে, সঙ্গে মোটা থামের মত পানির উচ্ছ্বাস নিয়ে।

ওপরের বি ডেকে নাবিকরা ওয়াটারটাইট হ্যাচ বন্ধ করার জন্যে ছুটল। বাকি সবাই মই বেয়ে ওপরে উঠে এল, পিছু ধাওয়া করেছে পানির পাঁচিল। দেরি করে ফেলেছে ওরা, বিপুল জলরাশি গ্রাস করে ফেলল, সঙ্গে করে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

সী ঈলের ব্রিজ থেকে সবই দেখছে ডিক মেনাচিম, বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসছে আপন মনে। ইতোমধ্যে আবার ফিরে আসছে চীনা মিগ দুটো। সঠিক পজিশনে আসবে ওগুলো, তার জন্যে অপেক্ষায় থাকল সে। তারপর চিৎকার করে নির্দেশ দিল, 'ফায়ার নাম্বার ওয়ান! ফায়ার নাম্বার টু!' ছোট এক জোড়া হিট-সীকিং মিসাইল সী ঈলের ডেক থেকে আকাশে উঠল, প্লেন দুটোর দিকে ছুটে যাচ্ছে।

কানে মিসাইল লক অ্যালার্মের আওয়াজ পেতেই চীনা পাইলটরা একটা রেডিও মেসেজ পাঠাল বেসে। তারা তাদের প্লেনগুলোকে নিয়ে বিপদ এড়াবার যথাসাধ্য চেষ্টা করল, কিন্তু কোন লাভ হলো না, হিট-সীকিং মিসাইল সরাসরি এঞ্জিনে আঘাত করল। মিগ দুটো বিস্ফোরিত হলো শূন্যে, একজোড়া আগুনের গোলা নেমে এল অন্ধকার সাগরে।

ওদিকে নটিংহামের প্রোপালশন সিস্টেম ডুবে গেছে, এঞ্জিনরূম থেকে কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না, জাহাজের স্টার্নও ডুবে গেছে চোদ্দ ডিগ্রীর মত। সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে কমান্ডার ফার্মোস সময় পেলেন মাত্র দুই সেকেন্ড। 'ঠিক আছে, জাহাজ ত্যাগ করার নির্দেশ দিলাম,' বললেন তিনি। তারপর হেলমসম্যানকে বললেন, 'অ্যাডমিরাল্টিতে এই মেসেজটা পাঠাও- "চীনা মিগের নিক্ষিপ্ত টর্পেডোর আঘাতে ডুবে যাচ্ছি"। আমাদের পজিশন জানাবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে মেসেজ পাঠাতে শুরু করল হেলমসম্যান। মস চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আমরা তলিয়ে যাচ্ছি, স্যার!'

এবার ইমার্জেন্সী লাইটও নিভে গেল।

পানির নিচে তলিয়ে যাচ্ছে নটিংহামের পিছন দিকটা, ফলে পানি থেকে ওপর দিকে উঠছে বো। লাইফজ্যাকেট পরা লোকজন ঠাণ্ডা পানিতে লাফ দিচ্ছে। লাইফ র‍্যাফট অ্যাকটিভেট করার সময় নেই হাতে। কারও ধারণাই ছিল না, কোন জাহাজ এত দ্রুত ডুবতে পারে।

যতক্ষণ পারা যায় জাহাজ খালি করার কাজটা চাক্ষুষ করলেন কমান্ডার ফার্মোস, তারপর স্ট্র্যাপ দিয়ে একটা লাইফজ্যাকেট বেঁধে তিনিও লাফ দিলেন পানিতে। পাঁচ মিনিট পর সারফেসে তেলতেলা একটা ভাব আর রয়্যাল নেভীর নাবিকদের ছোট্ট একটা গ্রুপ ছাড়া আর কিছু থাকল না। জানামতে জমিন বা তীর থেকে অনেক দূরে রয়েছে তারা, আশপাশে আর কোন জাহাজও নেই, কাজেই মৃত্যু প্রায় অবধারিত। চাঁদের ম্লান আলো দৃশ্য ও পরিবেশটাকে আরও করুণ করে তুলল।

তারপর যখন কালো ছায়াটা তাদের মাথার ওপর চলে এল, ঢেকে দিল চাঁদটাকে, বিহ্বল ও হতচকিত হয়ে পড়ল সবাই, জানে না কি ঘটছে। চোখ তুলে বিশাল কালো কাঠামোটা দেখে নিঃশ্বাস ফেলতেও ভুলে গেল। সী ঈল এগিয়ে এসে এমন একটা পজিশন নিল, নাবিকরা যাতে দুই পনটুনের মাঝখানে থাকে।

সী ঈলের পোর্টসাইড পনটুনে চলে এল মেনাচিম, বড় আকৃতির একটা বেল্ট-ফেড মেশিন গানের ব্রীচ টানল অভ্যস্ত হাতে। পাশে দাঁড়িয়ে আছে একজন ত্রু, হাতে একটা ক্যামকর্ডার। ট্রিগার টানার আগে সামনের পানিতে তাকিয়ে দৃশ্যটা উপভোগ করল মেনাচিম, খুনের নেশায় চকচক করছে চোখ দুটো। ফায়ার ওপেন করল সে, মাজল ঘুরিয়ে সী ঈলের সামনের পুরোটা অংশ কাভার করল। নিষ্ঠুর এই হত্যাকাণ্ড ক্যামকর্ডারের মাধ্যমে ভিডিওটেপে ধারণ করা হলো।

বুলেটে ঝাঁঝরা লাশগুলো সাগরের তলায় যদি নামত, তাহলে ছয়জন ডাইভারকে পাশ কাটাতে হত। সী ঈলের খোল থেকে বেরিয়ে এসেছে তারা, সঙ্গে নানা ধরনের যন্ত্রপাতি আর টর্চ। একজনের হাতে রয়েছে আন্ডারওয়াটার ভিডিও ক্যামেরা। একজন বাদে কারও কাছে কোন অস্ত্র নেই।

উঁকির তার অনুসরণ করে নটিংহামের কাছে পৌঁছে গেল ডাইভাররা। সাগরের মেঝেতে, গভীর একটা ফাটলের কাছে, স্থির হয়ে আছে ওটা। বিশাল কাঠামোর কোথাও কোন আলো বা প্রাণের ইঙ্গিত নেই। একজনের পিছনে আরেকজন, গর্তের ভেতর দিয়ে নটিংহামের খোলে ঢুকল তারা, এখনও উঁকির তার অনুসরণ করছে। আবর্জনা আর ধ্বংসস্তূপের ভেতর দিয়ে এগোল, তারপর

লীডারের ইশারায় স্থির হলো। ইঙ্গিতে একটা দরজা দেখাল সে। ভেতরে বড় একটা কামরা। বড় আকৃতির, লম্বা কি যেন সব রয়েছে। ভেতরে ঢুকে ওগুলোর গায়ে টর্চের আলো ফেলল লীডার। মাথা ঝাঁকাল সে, কাজ শুরু করার নির্দেশ দিল সঙ্গীদের।

একজন ডাইভার একটা অ্যাসেটিলিন টর্চ অন করে লঞ্চ প্যাডে কাজ শুরু করল, ক্ল্যাম্পগুলো গলিয়ে ফেলছে। ক্ল্যাম্পগুলো লঞ্চ প্যাডের সঙ্গে আটকে রেখেছে সাতটা সারফেস-টু-সারফেস ত্র□ুজ মিসাইল।

কাজটা শেষ হতে পনেরো মিনিট লাগল। নটিংহাম থেকে বেরিয়ে এসে সী ঈলে ঢুকে পড়ল ডাইভাররা, সঙ্গে করে নিয়ে এল একটা ত্র□ুজ মিসাইল। প্রোবিং মেশিন উঁকির তার টান টান হয়ে উঠল, সেটাও ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল নটিংহাম থেকে।

ফাউলার মিডিয়া গ্রুপ নেটওঅর্ক তার পূর্ব গোলার্ধের হেডকোয়ার্টার বানিয়েছে ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায়, সাতানব্বুইয়ের পয়লা জুলাইয়ে হঙকঙ চীনাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবার পর। তবে পশ্চিম গোলার্ধের জন্যে নতুন একটা হেডকোয়ার্টার খোলা হয়েছে জার্মানীর হামবুর্গে।

হামবুর্গের এফএমজিএন কমপ্লেক্স জনসাধারণের জন্যে এখনও খোলা হয়নি। সাড়ম্বর শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে কাল সন্ধ্যায়। ফিতে কাটা উপলক্ষে বিরাট পার্টি দেয়া হবে, প্রস্তুতি নিতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা। দুনিয়ার সমস্ত নামকরা প্রচার মাধ্যম তাদের প্রতিনিধি পাঠাবে, উপস্থিত থাকবেন বিশ্ব বিখ্যাত সব ব্যক্তিরা। মেঝে এখনও পালিশ করা হচ্ছে,

শুকানো হচ্ছে রঙ। রান্নাবান্নার আয়োজন চলছে, শুরু হয়ে গেছে ফার্নিচার সাজানোর কাজ। অনুষ্ঠানটা সবার জন্যেই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অর্ধচন্দ্র আকৃতির ভবনের ভেতর রয়েছে দুনিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম মিডিয়া কমপ্লেক্স, মাকড়সার জালের মত গোটা দুনিয়াকে ঘিরে রাখা ফাউলার কমিউনিকেশন নেটওঅর্কের হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্ক।

মাঝরাতের পর বেশিরভাগ কর্মচারী বাড়ি ফিরে গেল। বিল্ডিঙের বিভিন্ন অংশে অল্প কিছু লোক থাকলেও, তারা নিজেদের কাজে এত ব্যস্ত যে অন্য কোন দিকে খেয়াল নেই। বিশাল ও গোলাকৃতি কন্ট্রোল রূমে এখনও যে দু'জন লোক আছে, তারা তা জানে না। কমপ্লেক্সের শোপীস বলা চলে কন্ট্রোল রূমটাকে। নিউজরূমের বেশিরভাগই অন্ধকার, শুধু একজোড়া কনসোলে আলো জ্বলছে। কামরার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত একটা ফিতে ঝুলছে, কাল সন্ধ্যায় কয়েকশো আমন্ত্রিত অতিথির সামনে জন ম্যাডক ফাউলার ওটা কেটে নতুন হেডকোয়ার্টার উদ্বোধন করবে।

ম্যাডক ফাউলার সারাদিন পরিশ্রম করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কাউকে দায়িত্ব দিয়ে স্বস্তিবোধ করে না, ফলে প্রতিটি কাজের অগ্রগতি তার নিজেকে গিয়ে দেখে আসতে হয়। এই মুহূর্তে একটা কনসোলের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। যতই ক্লান্ত হোক, সামনের মনিটর তাকে পুরোপুরি সজাগ ও ব্যাকুল করে তুলেছে।

খায়রুল কবির আপাতত তার বেতনভুক কর্মচারী, তবে তথ্যটা আর সবার কাছে গোপন রাখা হয়েছে। কনসোলে বসে কন্ট্রোল নাড়াচাড়া করছে সে। ফাউলার জানে, খায়রুল কবির

দুনিয়ার সবচেয়ে সফল টেকনো-টেরোরিস্ট। ইলেকট্রনিক্সের দ্বারা সম্ভব যা কিছু আছে সব সে করতে পারে। ফাউলার খুশি হত কবিরকে এফএমজিএন-এর বৈধ কাজে লাগাতে পারলে, কিন্তু তার ত্রি□মিনাল রেকর্ডের জন্যে তা কখনও সম্ভব নয়। সেজন্যেই তাকে নেপথ্যে রাখতে বাধ্য হয়েছে সে।

ফাউলার দীর্ঘদেহী, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চেহারা। গত মাসে পঞ্চাশে পড়েছে, স্বাস্থ্য এখনও সবল। হাবভাব আর চালচলনে কর্তৃত্ব আর আভিজাত্য প্রকাশ পায়। কাঠামোটা স্থূল নয়, চুল সরতে শুরু করায় কপালটা বড় হয়ে উঠছে। ব্যক্তিত্বে এক ধরনের জাদু আছে, আশপাশের মানুষকে সম্মোহিত করে ফেলে। যখন কথা বলে, শুনতে বাধ্য হয় সবাই। পৌরুষদীপ্ত ভরাট কণ্ঠস্বর, তবে সুরটা মোলায়েম। প্রথম জীবনে উপস্থাপকের কাজ করেছে টেলিভিশনে, তখনই মিডিয়া কমিউনিকেশন সম্পর্কে তার আগ্রহ জন্মে, তার মাত্র তিরিশ বছর পর বিশাল এক সাম্রাজ্যের মালিক বনে গেছে। বালজাক যেমন বলে গেছেন, বিহাইন্ড এভরি ফরচুন দেয়ার ইজ আ ত্র□াইম, কথাটা ফাউলারের ক্ষেত্রেও সত্যি। ভদ্রলোক এক ইংরেজ লর্ডের অবৈধ সন্তান, মা জার্মান পতিতা। তার জন্ম হয় হংকঙে। অবৈধ সন্তান হওয়ায় স্বভাবতই উত্তরাধিকার সূত্রে লর্ডের বিষয়-সম্পত্তির কিছুই তার পাবার কথা নয়, পায়ওনি। তবে জ্ঞান হবার পর ফাউলার শপথ করে, লর্ডের সমস্ত সয়-সম্পত্তি একদিন না একদিন সে দখল করে নেবে। যা সে আইনের সাহায্যে পায় না, তা সংগ্রহ করেছে কৌশল, বুদ্ধি আর নিষ্ঠুরতা প্রয়োগ করে। ত্রিশ বছর বয়েসে পিতা লর্ডের সঙ্গে দেখা করে সে। ছেলেকে সামাজিকভাবে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করলেও, লর্ড ওয়েনডেল

নিজের দৈনিক পত্রিকায় একটা এডিটোরিয়াল পোস্টে চাকরি দিতে রাজি হন। সুঁই হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরুবার পরিকল্পনা পাকা করে ফেলে ফাউলার। সে যে ওয়েনডেলের সন্তান, কথাটা যতভাবে সম্ভব প্রচার শুরু করে, সেই সঙ্গে পত্রিকার নীতিতে আনে মৌলিক পরিবর্তন। এ নিয়ে লর্ডের সঙ্গে তার বিরোধ বাধলেও, পত্রিকার প্রচার সংখ্যা দিনে দিনে বাড়তে থাকায় ওয়েনডেল কোণঠাসা হয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে অবসর নিতে বাধ্য হন তিনি, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক করেন ফাউলারকে। ধীরে ধীরে জনপ্রিয় দৈনিকটির একমাত্র নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে ফাউলার। বছর দুই পর আত্মহত্যা করেন লর্ড ওয়েনডেল। অনেকেরই সন্দেহ, তাঁর এই আত্মহত্যায় ফাউলারের প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল, কিন্তু তা প্রমাণ করার জন্যে কেউই আইনের সাহায্য চায়নি।

বাপের ওপর ফাউলারের ক্ষোভ আর ঘৃণার কথা গোপন কোন ব্যাপার নয়, তেমনি হংকং ফিরে পাওয়ায় মূল চীনের ওপর তার ক্ষোভ আর ঘৃণাও চাপা থাকেনি। বাপ ইংরেজ, সেজন্যে ব্রিটেনকে সে শত্রু রাষ্ট্র হিসেবে জ্ঞান করে; আর চীনকে শত্রু মনে করে হংকংকে ফিরিয়ে নেয়ায়। তার চিন্তাধারার মধ্যে যুক্তির অভাব যতই থাকুক, নিজেকে সে কখনোই সংশোধন করার কথা ভাবে না।

ফাউলারের মা সন্তান প্রসবের পরপরই মারা যান। হংকংয়ের একটা গরীব চীনা পরিবারে মানুষ হয় ফাউলার।

পত্রিকার মালিক হবার পর মিডিয়া ব্যবসায়ী হিসেবে অবিশ্বাস্য উন্নতি করে সে। কয়েকটা টিভি ও রেডিও সেন্টার কিনে নেয়। জার্মানী, হংকং আর ব্রিটেন থেকে এক ডজন দৈনিক আর

বাইশটা সাপ্তাহিকী বের করে। এনএভিএসটিএআর-এর গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম, জিপিএস, তখনও কাজ শুরু করেনি, তাসত্ত্বেও ব্যবসায়িক দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়ে তাতে সে পুঁজি লাগায়। সেই পুঁজি সহস্র গুণ হয়ে উঠল জিপিএস স্যাটেলাইট নেভিগেশনের ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ায়। খায়রুল কবিরের অধীনে তার এঞ্জিনিয়াররা কমিউনিকেশন স্যাটেলাইটের ক্ষেত্রে নতুন টেকনলজি উদ্ভাবন করল, গালফ ওঅর-এর লাইভ কাভারেজ ট্র্যান্সমিট করল প্রথম যে-ক'টা নিউজ নেটওঅর্ক তার মধ্যে এফএমজিএন-ও থাকল। মাত্র অল্প কয়েক বছরের মধ্যে দুনিয়া জুড়ে নিজের একটা বিশাল যোগাযোগ সাম্রাজ্য গড়ে তুলল ম্যাডক ফাউলার।

আর এ-সব ছিল মাত্র শুরু।

তার একমাত্র শারীরিক সমস্যা হলো টিএমজে-টেমপোরোমান-ডিবিউলার জয়েন্ট সিনড্রোম। কোন ব্যাপারে উত্তেজিত বোধ করলে চোয়ালের পেশী ব্যথা করে, ক্লিক ক্লিক এমন একটা শব্দ শুনতে পায় যা প্রায় ধাতব বলে মনে হয়, আর যখনই মুখ খোলে বা খাবার চিবায় তখনই কর্কশ ঘর্ষণের একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি হয়। ডাক্তার কারণ হিসেবে বলেছেন যে ঘুমের মধ্যে দাঁতে দাঁত ঘষায় এমনটি হয়- বড় বেশি টেনশনের এ আরেকটা লক্ষণ। সাবধানতা অবলম্বনের জন্যে রাতে শোয়ার আগে ওপরের দাঁতে প্লাস্টিক গার্ড পরার পরামর্শ দেয়া হয়েছে তাকে, কিন্তু তা সে পরে না। যে-কোন পরামর্শ বা নির্দেশ অমান্য করার প্রবণতা এজন্য দায়ী হতে পারে। ব্যথায় কষ্ট পায়, কিন্তু ভুলেও আর ডাক্তারের কাছে যায় না।

সামনের তিনটে মনিটরের বোতামে চাপ দিল খায়রুল কবির। একটায় জার্মান স্যাডিস্ট ডিক মেনাচিমের চেহারা ফুটে উঠল। দক্ষিণ চীন সাগরে, সী ঈলে রয়েছে সে। 'সব কিছু রেকর্ড করা হয়েছে,' ক্যামেরার দিকে মুখ তুলে বলল মেনাচিম। 'এখনও আমি টেপ দেখিনি, তবে শুনলাম ভিউফাইন্ডারের মাধ্যমে দারুণ ছবি পাওয়া গেছে।'

দ্বিতীয় মনিটরে ছয়জন ডাইভারের পা দেখা গেল, জলমগ্ন ও বিধ্বস্ত নটিংহামের দিকে এগোচ্ছে। ছবির রঙ ও আলো খুবই ভাল। তৃতীয় মনিটর জ্যান্ত হয়ে উঠল, তাতে দেখা যাচ্ছে সী ঈলের ত্র□রা মেশিন-গান থেকে গুলি করছে পানিতে।

'দেখুন, দেখুন, ব্যাটা পালাবার চেষ্টা করছে। হা হা হা। ওই পটল তুলল। একটু হয়তো সবুজের ভাব বেশি, তাছাড়া সব ঠিকই আছে, কি বলেন?'

ফাউলার ভাবছে, এ-ধরনের কাজ বড় বেশি উপভোগ করে মেনাচিম, তবে লোকটা তার খুব দামী কর্মচারী।

ডাইভারদের নটিংহামে ঢুকতে দেখল ফাউলার, সাতটা ত্র□জ মিসাইলের একটা নিয়ে বেরিয়ে এল তারা। তারপর দেখল নটিংহামের নাবিকরা একে একে মারা গেল গুলি খেয়ে। পরিচ্ছন্ন কাজ, কোথাও কোন খুঁত নেই। মাইত্রে□াফোনে কথা বলল সে, 'ভাল কাজ দেখিয়েছ, মেনাচিম। এবার খানিক ঘুম দাও...যদি আসে আর কি।'

হেসে উঠল মেনাচিম। 'ঘুম? বস্, আপনি ঠাট্টা করছেন। এরকম একটা রাত কাটাবার পর আমাকে একটা উৎসবের আয়োজন করতে হবে। হা হা হা।'

শিউরে উঠল ফাউলার, কারণ মেনাচিমের উৎসব সম্পর্কে তার ধারণা আছে। শোনা যায় মেনাচিম যখন উৎসব থেকে বিদায় নেয়, পিছনে কয়েকটা পঙ্গ ও থেঁতলানো শরীর পড়ে থাকে।

'উৎসবের ভিডিওটেপ দেখতে চান, বস্?' জানতে চাইল মেনাচিম।

'এবার না, ডিক।'

স্যাটেলাইট আপলিঙ্কঢ়ডাউনলিঙ্ক লেখা অন্য একটা কনসোলে সরে গেল খায়রুল কবির। সীটে বসে চারকোনা, রুলার আকৃতির একটা ডিভাইস খুলল কন্ট্রোল প্যানেলের প্লাগ থেকে। চৌকো লাল একটা বাক্সে ডিভাইসটা ভরে রাখল সে। এই বাক্সটাই খাইবার পাসে কিনেছিল। কনসোল ছেড়ে ফাউলারের পাশে এসে দাঁড়াল, বলল, 'এবার বলুন, মি. ফাউলার, আমার কারিগরি বিদ্যা আপনাকে মুগ্ধ করেছে কিনা। আমি কি একটা জিনিয়াস নই?'

উত্তর না দিয়ে মাইক্রোফোনে মেনাচিমকে নির্দেশ দিল ফাউলার, 'ডিক, টেপটা আবার চালাও তো দেখি।'

রয়্যাল নেভীর নাবিকদের মেশিন গানের ঝাঁক ঝাঁক বুলেট ঝাঁঝরা করে ফেলছে, দৃশ্যটা আরেকবার দেখল ফাউলার। তৃতীয়বার দেখল পোমোশনে। তারপর কবিরের দিকে ফিরে বলল, 'হ্যাঁ, কোন সন্দেহ নেই। আপনি সত্যি জিনিয়াস।'

স্বীকৃতি পেয়ে তৃপ্তির হাসি হাসল টেকনো-টেরোরিস্ট খায়রুল কবির।

তিন

রানা লন্ডনে এসেছে বিএসএস চীফ মারভিন লংফেলোর জরুরী আহ্বানে। তিনি নাকি ভয়ানক এক সঙ্কটে পড়েছেন, চাকরি যায় যায় অবস্থা। শুধু তিনি নন, ব্রিটেনও নাকি খুব বড় একটা বিপদে জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে। সরাসরি রানার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি, কারণ রানা পেশোয়ার থেকে ইসলামাবাদে চলে গিয়েছিল। বিএসএস চীফ বিসিআই হেডকোয়ার্টার ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ করেন, কথা বলেন মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের সঙ্গে। বহুকাল আগে রয়্যাল নেভীতে দু'জন একসঙ্গে কাজ করেছেন, সম্পর্কটা বন্ধুত্বের, কাজেই রাখ-ঢাক না করে নিজের ও ব্রিটেনের বিপদের কথা খুলেই বলেছেন। রাহাত খান জরুরী বার্তা পাঠিয়ে সব কিছুই অবহিত করছেন রানাকে, সেই সঙ্গে নির্দেশ দিয়েছেন প্রয়োজন অনুসারে মারভিন লংফেলোকে রানার সাহায্য করতে হবে।

হিথরো এয়ারপোর্টে নেমে কাস্টমসের ঝামেলা সারল রানা, টার্মিনাল ভবনে ঢুকতেই দেখা হলো বিএসএস-এর একজন

এজেন্টের সঙ্গে। ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে ঢোকার পাস পাওয়া গেল তার কাছ থেকে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিল্ডিংটা হোয়াইট হলে। রানা এজেন্সির লন্ডন শাখা আগেই খবর পেয়েছিল, তারা রানার প্রিয় বাহন অ্যাসটন মার্টিন গাড়িটা পাঠিয়ে দিয়েছে এয়ারপোর্টে। গাড়ি নিয়ে বিল্ডিংটার পিছনের রাস্তায় পৌঁছুল রানা, পাস দেখিয়ে সিকিউরিটি গেট পেরুল, পার্ক করল মারভিন লংফেলোর রোলস রয়েসের পিছনে।

রানাকে বাদ দিয়েই শুরু হয়ে গেছে মীটিং। ভেতরে খুব হৈ-চৈ। স্টাফ অফিসাররা হুকুম করছেন, রিপোর্ট সংগ্রহ করছেন। দেয়াল জোড়া ভিডিও স্ক্রীনে দেখা যাচ্ছে দক্ষিণ চীন সাগরে যাবার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে রয়্যাল নেভীর জাহাজ বহর। একটা মনিটরে দেখা যাচ্ছে আগের সেই ভিডিও, খাইবার পাসের চোরা বাজার থেকে লাল একটা চৌকো বাক্স কিনছে খায়রুল কবির। কামরার ভেতর পদক আর মেডেলের ছড়াছড়ি, দেখে রানা আশ্চর্য হলো না। উপস্থিত প্রায় সবাইকেই চিনতে পারল ও- ফার্স্ট সী লর্ড, অ্যাডমিরাল রবিনহুড, মারভিন লংফেলো, বিল হ্যামারহেড।

যে-কোন কারণেই হোক, অ্যাডমিরাল রবিনহুড সাংঘাতিক খেপে আছেন বলে মনে হলো। আক্ষরিক অর্থেই থরথর করে কাঁপছেন তিনি। মারভিন লংফেলোকে অস্বাভাবিক গম্ভীর লাগছে।

অ্যাডমিরাল রবিনহুড চিৎকার করে কথা বলছেন, 'আপনি রয়্যাল নেভীর বিরুদ্ধে, চীনা এয়ার ফোর্সের পক্ষে কথা বলছেন! এ কিভাবে সম্ভব?' তাঁর চেহারা লাল হয়ে আছে রাগে।

'এ আপনার ভিত্তিহীন অভিযোগ!' প্রতিবাদ করলেন মারভিন

লংফেলো।

'ওরা আমাদের একটা জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে, অথচ আপনি একটা "জয়েন্ট ইনভেস্টিগেশন" চাইছেন? আপনার কাছ থেকে এ-ধরনের কাপুরুষতা...'

'আমার সঙ্গে একমত না হতে চান, না হন, কিন্তু ওই কাপুরুষতা শব্দটা আবার যদি ব্যবহার করেন, আপনাকে আমি একপাশে সরে দাঁড়াতে বলব,' অস্বাভাবিক শান্ত গলায় বললেন মারভিন লংফেলো।

বোবা হয়ে থাকা বিল হ্যামারহেডের দিকে তাকাল রানা, এই সময় কামরায় ঢুকলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী- চেহারাই বলে দিল, মারভিন লংফেলোর শেষ কথাটা শুনে ফেলেছেন। 'কি ব্যাপার?' জানতে চাইলেন তিনি। 'মি. লংফেলো, কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি অ্যাডমিরাল রবিনহুডকে চ্যালেঞ্জ করছেন...পাঞ্জা লড়ার?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই, চ্যালেঞ্জই করছি।'

'এটা ছোটখাট বিষয় নিয়ে ঝগড়া করার সময় নয়, কারণ ব্রিটেন একটা জাতীয় সঙ্কট মোকাবিলা করছে!' ঘোষণা করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। 'দশ মিনিটের মাথায় শুরু হতে যাচ্ছে ইমার্জেন্সী কেবিনেট মীটিং। আপনারা পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা দিন আমাকে।'

ফার্স্ট সী লর্ড বললেন, 'অ্যাডমিরাল শেলওয়ানের সঙ্গে এখন তিনটে ফ্রিগেট রয়েছে, কালকের মধ্যে আরও তিনটে পৌঁছে যাবে।'

'কাল ওখানে আমাদের পঞ্চাশটা ফ্রিগেট পৌছুলেও কোন লাভ নেই,' বললেন মারভিন লংফেলো, 'কারণ, আমাদের

জাহাজ-গুলোর কাছ থেকে চীনাদের বৃহত্তম এয়ার ফোর্স বেস মাত্র দশ মিনিটের পথ। আমি বলতে চাইছি, অত কাছাকাছি আমাদের জাহাজ বহরকে চীন থাকতে দেবে না। ভেবে দেখুন, আমরা কি ইংলিশ চ্যানেলে চীনাদের জাহাজ বহরকে থাকতে দেব?'

হাত ছুঁড়ে অ্যাডমিরাল রবিনহুড বললেন, 'তারমানে আপনি বলতে চাইছেন ওরা আমাদের জাহাজ ডুবিয়ে দিলেও আমরা সেটা বিনা প্রতিবাদে মেনে নেব?'

'আরে ধ্যাত,' তাঁর দিকে কটমট করে তাকালেন মারভিন লংফেলো। 'তা কেন...'

স্প্লীজ!' গলা চড়ালেন মন্ত্রী। 'মি. লংফেলো, আপনি আসলে ঠিক কি বোঝাতে চাইছেন বলুন তো।'

বিএসএস চীফকে কথা বলতে না দিয়ে অ্যাডমিরাল বললেন, 'উনি বলতে চাইছেন চীনা পাইলটরা কোন ভুল করেনি, আমাদের জাহাজই নাকি কোর্স ছেড়ে চীনা উপকূলের কাছাকাছি চলে গিয়েছিল। লেটেস্ট স্যাটেলাইট নেভিগেশন সিস্টেম যাই বলুক!'

'আমি বলতে চাইছি,' লংফেলো বললেন, 'জিপিএস সিস্টেমে কারিগরি ফলানো হয়ে থাকতে পারে।'

'আমার ধারণা ছিল তা সম্ভব নয়,' মন্তব্য করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী।

'বিল!' ডাক দিলেন বিএসএস চীফ।

ব্রিটিশ সিক্রে□ট সার্ভিসের চীফ অব স্টাফ, রানার পুরানো বন্ধু, মারভিন লংফেলোর সাহায্যে এগিয়ে এলেন। 'আপনি তো জানেনেই, স্যার, সমুদ্রের জাহাজ ও আকাশের প্লেন, গ্লোবাল পজিশনিং স্যাটেলাইট সিস্টেম অর্থাৎ জিপিএস-এর ওপর নির্ভর

করে। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতিরক্ষা দফতরের একটা স্যাটেলাইট নেটওঅর্ক বিরতিহীনভাবে টাইম সিগনাল ব্রডকাস্ট করে, ল্যান্ড-বেসড অ্যাটমিক ক্লক থেকে সংগ্রহ করার মাধ্যমে।'

'এ-সব আমার জানা,' প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বললেন। 'এবং আমার হাতে সময় আছে আর মাত্র পাঁচ মিনিট।'

সামান্য বিব্রত হ্যামারহেড আরও দ্রুত কথা বলছেন, 'এই সিগনালগুলো এনকোডেড, কাজেই রিসিভার জানে কোন স্যাটেলাইট কি সিগনাল ব্রডকাস্ট করছে। অ্যাটমিক ক্লক সিগনাল এনকোডিং সিস্টেম, আমেরিকানরা যেটাকে এসিএসইএস বা অ্যাকসেস বলে- অত্যন্ত সতর্ক প্রহরায় রাখা মার্কিন সরকারের একটা গোপন ডিভাইস।'

হ্যামারহেড কথা বলছেন, এই সময় একজন স্টাফ অফিসার একগাদা খবরের কাগজ নিয়ে ঝড়ের বেগে কামরায় ঢুকলেন। কাগজগুলো সবাইকে তিনি বিলি করছেন। হাতে পাওয়া একটা কাগজের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী।

ওদিকে হ্যামারহেড আবার তাঁর কথা শুরু করেছেন, 'গোটা দুনিয়ায় সব মিলিয়ে মাত্র বাইশটা অ্যাকসেস ডিভাইস আছে।'

'মাই গড!' আঁতকে উঠলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। 'এ কী দেখছি!' নিজের কাগজটা মারভিন লংফেলোর সামনে মেলে ধরলেন তিনি। 'এক্সকিউজ মি, মি. লংফেলো। দৈনিক আগাম খবর-এর সর্বশেষ সংস্করণটা একবার দেখুন।'

আগাম খবর-এর হেডলাইনটা যেন চিৎকার করছে।

'লাশগুলো উদ্ধার করেছে একটা ভিয়েৎনামী জেলে নৌকা,'

খবরটা পড়ছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। ‘কেউ কেউ সতেরো বছরের কিশোর মাত্র।’

পড়ছেন অ্যাডমিরালও, ‘বুলেটগুলো পরীক্ষা করে দেখা গেছে, চীনাদের মিগগুলো এই বুলেটই ব্যবহার করে।’

চীফ অভ স্টাফ বিল হ্যামারহেডের দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপাত্মক সুরে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বললেন, ‘আবার শুরু করুন, মি. হ্যামারহেড।’

‘এর আগে বলেছি বাইশটা অ্যাকসেস ডিভাইস আছে। আসলে তেইশটা ছিল। ধারণা করা হয় একটা ইউএস ট্র্যান্সপোর্ট প্লেন বিধ্বস্ত হবার সময় ওটা হারিয়ে গেছে...’

খবরের কাগজের উত্তেজক শিরোনাম দেখতে ব্যস্ত সবাই, বিল হ্যামারহেড শ্রোতাদের মনোযোগ ধরে রাখতে পারছেন না, লক্ষ করে একটা মনিটরের সামনে এসে দাঁড়াল রানা- ওটায় খায়রুল কবিরের ভিডিও টেপ চালু রয়েছে। বোতামে চাপ দিল ও, ফ্রেমটা স্থির হয়ে গেল, তাতে দেখা যাচ্ছে লাল বাক্সটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কবির। ‘ওটাই হলো হারানো অ্যাকসেস,’ গলা চড়িয়ে বলল রানা, সবাই যাতে মনোযোগ দেয়। ‘যার হাতে ওটা রয়েছে তার মত টেকনিকালি সফিসটিকেটেড হলে যে-কেউ একটা সাধারণ স্যাটেলাইটকে দিয়ে জিপিএস স্যাটেলাইটের কাজ করাতে পারবে, অর্থাৎ তার পক্ষে যে-কোন জাহাজকে নির্দিষ্ট কোর্স থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব।’

রানার নাকের সামনে নাক নিয়ে এসে অ্যাডমিরাল রবিনহুড তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইলেন, ‘কিন্তু আপনি কে, স্যার?’

‘আমি ব্ল্যাক নাইট, অ্যাডমিরাল,’ জবাব দিল রানা। ‘চিনতে

পারছেন না? ব্ল্যাক নাইট, যে আপনার নাম পাল্টাবার সুপারিশ করেছিল।'

'হোয়াট!' কোন সূত্র নেই, কাজেই প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বিস্মিত।

লংফেলোর দিকে তাকালেন অ্যাডমিরাল। 'আমি ডিটেলস জানতে চাই। উনি শ্বেতাঙ্গ নন। তাহলে?'

'অশ্বেতাঙ্গ বহু লোক রয়্যাল নেভীতে আছে,' জবাব দিলেন বিএসএস চীফ, 'ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসে থাকবে না কেন? উনি মাসুদ রানা, আমাদের অনারারি অ্যাডভাইজার।' হ্যামারহেডের দিকে ফিরলেন তিনি। 'বিল, তোমার কথা শেষ করো।'

'এফএমজিএন স্যাটেলাইটের কথা আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন। ওগুলো নিউজ স্যাটেলাইট, এখনও ব্রডকাস্ট করার অনুমতি পায়নি। ওই রাতে ওদের একটা স্যাটেলাইট চীনের ওপর ছিল, সেটা থেকে একটা সিগনালও পাঠানো হয়।'

'তারমানে কি ওই সিগনাল জাহাজটাকে কোর্স থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়?' জিজ্ঞেস করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী।

'মি. লংফেলো তা বলতে পারেন না,' চ্যালেঞ্জের সুরে প্রশ্ন করলেন অ্যাডমিরাল, স্পারেন কি?'

স্পারি না,' বললেন লংফেলো। 'আমরা শুধু জানি যে তা সম্ভব।' রানার দিকে তাকালেন তিনি, মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল রানা।

'অর্থাৎ কোন প্রমাণই নেই,' অ্যাডমিরাল গলা চড়ালেন। 'কিন্তু আমাদের জাহাজ বহর যখন নটিংহামকে খুঁজে পাবে, প্রমাণের কোন অভাব হবে না। শুধু বিএসএস চীফ মি. লংফেলো বলছেন বহর পাঠানো উচিত হবে না। উনি চাইছেন হাতে হ্যাট নিয়ে

চীনাদের কাছে যাই আমরা, "জয়েন্ট ইনভেস্টিগেশন"-এর জন্যে অনুরোধ করি। এরচেয়ে অদ্ভুত কথা আর কি হতে পারে!'

'কথাটা কি সত্যি?' লংফেলোর দিকে তাকালেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী।

'হ্যাঁ, এটাই আমার সুপারিশ। তবে মাথা নত করে যাবার কথা আমি বলিনি,' জবাব দিলেন বিএসএস চীফ।

'মি. লংফেলো,' মাথা নাড়ছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, 'না- এ অসম্ভব। সব ক'টা জাতীয় দৈনিক প্রতিশোধ নিতে বলছে। যৌথ তদন্তের কথা বললে মিডিয়া আমাদের কল্লা চাইবে।'

'আমি বরং মিডিয়ার মুখোমুখি হব, বলব জাহান্নামে যাও; কিন্তু মিডিয়ার ভয়ে দেশটাকে বিপদের মধ্যে ফেলতে পারব না।'

প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর চোখ জোড়া কুঁচকে উঠল। 'আমার সঙ্গে এদিকে একটু আসুন, প্লীজ, মি. লংফেলো।'

লংফেলোকে নিয়ে এক পাশে সরে গেলেন তিনি।

আরেক পাশে সরে এল রানা, বিল হ্যামারহেডের সঙ্গে। 'বস্ ঠিক কথাই বলছেন, তবে এবার তিনি বোধহয় অধিকারের মাত্রা ছাড়িয়ে গেছেন,' ফিসফিস করলেন হ্যামারহেড। 'ওরা না তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন।'

'বাজি ধরে বলতে পারি ব্যাপারটা অত দূর গড়াবে না,' মন্তব্য করল রানা।

'আপনার গাড়ির চাবিটা আমাকে দেবেন?'

'উঁহুঁ, গাড়ি বাজি ধরতে রাজি নই আমি।'

'না, না- চাবি চাইছি আর কাউকে দিয়ে গাড়িটা রানা এজেন্সিতে পাঠাব, তাই। আপনি আমাদের সঙ্গে যাবেন।'

প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে কথা শেষ করে ঘুরলেন মারভিন লংফেলো, ঠোঁট জোড়া পরস্পরের সঙ্গে চেপে আছে, অ্যাডমিরালকে পাশ কাটালেন, তারপর পাশ কাটালেন রানা ও হ্যামারহেডকে। রানা ও হ্যামারহেড দৃষ্টি বিনিময় করল, তারপর তাঁর পিছু নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে এল।

রোলস-রয়েসের জাম্প সীটে বসল রানা, মারভিন লংফেলো আর বিল হ্যামারহেডের দিকে মুখ করে। শোফার গাড়ি ছাড়ার পরও বিএসএস চীফ কথা বলছেন না, তবে তাঁকে শান্ত ও ঠাণ্ডা দেখাচ্ছে। বিপদ যত গুরুতরই হোক, বিচলিত হতে জানেন না। ঠিক পথে আছেন, এই বিশ্বাস তাঁকে শক্তি ও সাহস যোগাচ্ছে।

ক্রিস্টাল ডিক্যান্টার থেকে দুটো গ্লাসে স্কচ ঢাললেন হ্যামারহেড, মারভিন লংফেলো একটা বোতামে চাপ দিলেন। রানার পাশে একটা প্যানেল সরে গেল, বেরিয়ে পড়ল একটা সফিসটিকেটেড কমিউনিকেশন বোর্ড। আরেকটা বোতামে চাপ দিলেন তিনি, এবার রানার মাথার পিছন থেকে প্রাইভেসী প্যানেল সরে গেল, দেখা গেল শোফারের পাশে বসে রয়েছে সূর্যমুখীর সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিএসএস চীফের প্রাইভেট সেক্রেটারি জুলিয়া পার্কার। জুলিয়া জেমস বন্ডের প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিল, বন্ড অ্যাক্সিডেন্ট করে ছুটিতে থাকায় নতুন দায়িত্ব পেয়েছে। তার সঙ্গে টেলিফোন আর ল্যাপটপ কমপিউটর রয়েছে। গাড়িতে বিএসএস চীফের মোবাইল অফিস শুধু নয়, মোবাইল আউটার অফিসও আছে।

'ইভনিং, রানা,' জুলিয়া বলল। রোদ লেগে তার লালচে চুল

চকচক করছে।

'ইভনিং, জুলিয়া,' বলে হাসল রানা।

গ্লাসে চুমুক দিয়ে মারভিন লংফেলো বললেন, 'জুলিয়া, দৈনিক এক্সপ্রেসে একটা খবর পাঠাও। বলো, সরকার আমাকে বরখাস্ত করতে চায়, কিন্তু সবার নামে আমার কাছে ফাইল থাকায় ভয় পাচ্ছে।'

এরপর রানা ও হ্যামারহেডের দিকে তাকালেন তিনি, বললেন, 'খবরটা ছাপা হলে দিন দুই সময় পাওয়া যাবে। কার চাকরি গেল বা থাকল সেটার কোন গুরুত্ব নেই, এই দু'র্দিনে ব্রিটেন এমন একটা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারে যে যুদ্ধে জেতার কোনই সম্ভাবনা নেই আমাদের। ওঁদের ধারণা ওঁরা ঠিক পথে আছেন। তাছাড়া, ওঁদের হাতে প্রমাণও প্রচুর। আমাদের হাতে কিছুই নেই। শুধু দু'তিনটে জিনিস মিলছে না।'

'আমার যদি কিছু করার থাকে...,' ভদ্রতাবশত শুরু করল রানা।

'তোমার চীফের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, রানা,' মারভিন লংফেলো বললেন। 'তিনি আমাকে অনুমতি দিয়েছেন।'

'কিসের অনুমতি?' জানতে চাইল রানা।

পকেট থেকে একটা কমপিউটর প্রিন্টআউট বের করে রানার হাতে ধরিয়ে দিলেন বিএসএস চীফ। 'এটা দেখো। তিনি বলেছেন, আমাকে তুমি সাহায্য করবে।'

প্রিন্টআউটে চোখ বুলিয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'বেশ। কি করতে হবে আমাকে?'

'আমরা হিথরোয় যাচ্ছি, রানা,' বললেন লংফেলো। 'তোমাকে

একটা প্লেন ধরতে হবে।’

শুনে রোমাঞ্চিত হলো রানা। ‘কোথায় যাচ্ছি, মি. লংফেলো? বেইজিং? নাকি হঙকঙ?’

‘না। হামবুর্গে। আমার ধারণা ম্যাডক ফাউলারের স্ত্রীকে তুমি চেনো।’

ভুরু কোঁচকাল রানা। ‘হ্যাঁ। এক সময় তাকে খুব ঘনিষ্ঠভাবেই চিনতাম। তখন তার পরিচয় ছিল পামেলা ক্যাম্পবেল। কিন্তু সে খবর খুব কম লোকই জানে।’

চোখ ঘুরিয়ে জুলিয়ার দিকে তাকাল রানা, সে ঠোঁট টিপে হাসছে। ‘উল্টোটাই বরং সত্যি, রানা। আমরা এসপিওনাজে আছি, ভুলে যেয়ো না।’

লংফেলো বললেন, ‘ওখানে হ্যামারহেড যখন স্যাটেলাইটের কথা বলছিল, তুমি আমার দিকে তাকিয়েছিলে- কেন, রানা?’

‘উনি ফাউলার মিডিয়া গ্রুপ নেটওঅর্ক-এর স্যাটেলাইট সম্পর্কে বলছিলেন, কাজেই আমার মনে পড়ে যায় দৈনিক আগাম খবরের মালিকও ফাউলার।’

‘ঠিক তাই,’ রানাও একই লাইনে চিন্তা করছে দেখে খুশি হয়ে উঠলেন বিএসএস চীফ। ‘আমাদের কোন এজেন্টকে না ডেকে তোমার সাহায্য চাওয়ার কারণটা হলো, রানা, এর সঙ্গে খায়রুল কবির জড়িত। সে তোমার স্বদেশী হওয়ায় তার মন-মানসিকতা তুমিই ভাল বুঝবে। বিপদের জড় প্রথম সুযোগেই উপড়ে ফেলতে চাই আমি। তবে মনে রাখবে, প্রথম প্রায়োরিটি খায়রুল কবির নয়। তোমার কাজ হবে নটিংহাম ডোবার জন্যে চীনারা দায়ী নয়, এটা প্রমাণ করা। বিল।’

বিল হ্যামারহেড তৈরি হয়েই ছিলেন, মোটা একটা ফাইল ধরিয়ে দিলেন রানার হাতে। 'ম্যাডক ফাউলারের ডোশিয়ে। তার সম্পর্কে যা কিছু জানার সব আপনি এতে পাবেন।'

হিথরোর পথে মটরওয়েতে উঠে এল রোলস-রয়েস। আর কয়েক মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবে ওরা।

রানা জানতে চাইল, 'আপনার ধারণা এর সঙ্গে ফাউলার জড়িত?'

'এশিয়া থেকে এফএমজিএন স্যাটেলাইট অজ্ঞাত একটা সিগনাল পাঠাবার ঠিক আগে এফএমজিএন-এর হামবুর্গ ব্রডকাস্ট সেন্টার থেকেও আরেকটা অজ্ঞাত সিগনাল পাঠানো হয়েছে,' জবাব দিলেন হ্যামারহেড। 'ওই সেন্টার এখনও খোলা হয়নি, খোলা হবে আজ রাতে। ফাউলার সেখানে বিরাট একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে।'

রানার হাতে একটা এনভেলাপ ধরিয়ে দিল জুলিয়া। 'তোমার টিকেট, কাভার স্টোরি আর কার রিজার্ভেশন,' বলল সে। 'এখানে সই করো, প্লীজ।'

এনভেলাপটা নিচ্ছে রানা, লংফেলো বললেন, 'ফাউলার স্যাটেলাইটের মালিক। কবিরকে তুমি এমন একটা ডিভাইস কিনতে দেখেছ যেটা শুধু স্যাটেলাইটের কাজে ব্যবহার করা যায়। তোমাকে দেখতে হবে দুটোর মধ্যে যোগাযোগ আছে কিনা। ফাউলারকে একটু খোঁচাও। তার স্ত্রী...'

'জানি না আমার কথা পামেলার মনে আছে কিনা।'

'মনে করিয়ে দেয়া যায়,' ফিসফিস করল জুলিয়া। 'তোমার মত হ্যান্ডসাম পুরুষ একটা মেয়ের কাছ থেকে যে-কোন তথ্য

আদায় করতে পারবে।'

'কই, তোমার কাছ থেকে তো পারি না,' রানাও পাল্টা ফিসফিস করল।

মিষ্টি হেসে মাঝখানের পার্টিশনটা টেনে দিল জুলিয়া। রানার দিকে ঝুঁকে বিএসএস চীফ বললেন, 'ফাইলটা পড়ার পর মনে হবে স্রেফ বড় একটা পার্টিতে যাচ্ছ তুমি। কিন্তু আমার যদি ভুল না হয়, তুমি ভয়ানক এক বিপদের মধ্যে থাকবে।'

'হুঁ।'

ইতিমধ্যে হিথরো এয়ারপোর্টের সিকিউরিটি গেট পেরিয়ে টারমাকে ঢুকে পড়েছে রোলস-রয়েস। একটা ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ সেভেন-ফাইভ-সেভেন আকাশে ওঠার জন্যে তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে। গ্রাউন্ড ক্রুরা এয়ারক্রাফটের দিকে মই ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল রোলস-রয়েস।

'সাবধানে থাকবে, রানা,' রানা গাড়ি থেকে নামার আগে মারভিন লংফেলো বললেন। 'তোমাকে আমি শ্রদ্ধেয় বন্ধুর কাছ থেকে ধার হিসেবে পেয়েছি, বহাল তবিয়তে ফিরিয়ে দিতে না পারলে মুখ দেখাতে পারব না।'

সেভেন-ফাইভ-সেভেন বিকেলে ল্যান্ড করল হামবুর্গে। টার্মিনাল ভবনটা অত্যাধুনিক, ছাদ দেখে মনে হয় কোন প্লেনের বিশাল একটা ডানা। ভেতরে অসংখ্য দোকান আর রেস্তোরাঁ আছে।

হামবুর্গ শহরে একাধিক খাল থাকায় প্রায়ই ভেনিস আর আমস্টারডামের সঙ্গে তুলনা করা হয়। বারোশো বছরের পুরানো শহর, স্বভাবতই সমৃদ্ধ একটা ইতিহাস আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের

পর শহরটাকে নতুন করে গড়ে তোলা হয়েছে। পার্কগুলো বিশাল, বহুতল ভবনগুলো আক্ষরিক অর্থেই আকাশ ছোঁয়া, চারদিকে ছড়িয়ে আছে নামকরা সব সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। হামবুর্গ জার্মানীর দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর, সবচেয়ে সবুজ বলেও দাবি করা হয়। সারফেস এরিয়ার পঞ্চাশ ভাগ জুড়ে রয়েছে পানি, খেত-খামার, বনভূমি ও এক হাজার চারশো বাগান আর পার্ক।

হামবুর্গে আগেও কয়েকবার এসেছে রানা, শহরের সব কিছু চেনে। এক বাংলাদেশীর রেন্ট-আ-কার কোম্পানী পক্ষীরাজ-এ চলে এল ও, সুন্দরী এক বঙ্গললনাকে বলল, 'আমার অফিস একটা কার রিজার্ভ করেছে।' জুলিয়ার দেয়া রিজার্ভেশন নম্বরটা জানাল ও। এক মিনিট, বলে কাউন্টার থেকে সরে গেল মেয়েটা। পক্ষীরাজ হামবুর্গে বিসিআই-এর একটা কাভার, জানে রানা। ভাবছে কি গাড়ি দেয়া হবে ওকে। বিসিআই-এর টেকনিকাল ব্রাঞ্চ ইউরোপে একটা জাগুয়ার এক্সকেএইট-এর ওপর কারিগরি ফলাচ্ছে বলে গুজব শুনেছে ও, শোনার পর থেকে খুব ইচ্ছে একবার চালিয়ে দেখে, কিন্তু এখন পর্যন্ত সুযোগ পায়নি।

এম. আর. নাইনের ট্রেনিং ভূমিকা পালন করল, বেমানান কিছু চোখে পড়ে কিনা দেখার জন্যে সহজ-স্বাভাবিক ভঙ্গিতে চারদিকে দৃষ্টি বোলাল রানা। কামরার চারদিকটা দেখা শেষ করেছে, চোখ পড়ল নিউজস্ট্যান্ডে ঝুলন্ত 'আগাম খবর'-এর ওপর। হেডলাইন দাবি করছে- চীন ব্রিটিশ জাহাজ বহরকে সাবধান করে দিয়েছে।

'এখানে আপনাকে সই করতে হবে, মি. রানা, প্লীজ।' পিছন থেকে বলল কেউ, গলাটা রানা সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল। ঘুরে তাকাতেই পক্ষীরাজের লাল জ্যাকেট পরা সলিল সেনকে চিনতে

পারল ও। পরস্পরের বন্ধু ওরা, সলিলও বিসিআই এজেন্ট। তাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। হেসে উঠে দু'জনের কাভারই ফাটিয়ে দিতে যাচ্ছিল রানা, শেষ মুহূর্তে কোনমতে সামলে নিল নিজেকে। কাউন্টার থেকে বীমা কোম্পানীর একটা ফর্ম তুলে নিয়ে রানার সামনে রাখল সলিল, 'আপনার নতুন গাড়ির জন্যে এই ফর্মটা পূরণ করতে হবে, মি. রানা।'

লাইনে দাঁড়ানো কয়েকজন লোক ওদের কথা শুনছে, ফর্মটা পূরণ করার পর নিচু গলায় কথা বলল রানা, 'আর কোন রকম প্রটেকশন দরকার আছে আমার?'

'আছে, দোস্ত,' বলে কাউন্টারের পিছনের একটা দরজা খুলে নিঃশব্দে ইঙ্গিত করল সলিল। ঘুরে কাউন্টারের ভেতর দিকে ঢুকল রানা, তারপর সলিলের পিছু নিল। দরজা টপকে বিশাল এক গ্যারেজে ঢুকল ওরা। ভেতরে কোথাও কোন গাড়ি নেই, তবে কাঠের কয়েকটা প্রকাণ্ড বাক্স দেখা গেল, একেকটা মাঝারি আকৃতির ঘরের মত, তাতে লেখা পক্ষীরাজ ট্র্যান্সপোর্ট এজেন্সি। সলিল বলল, 'আমি এখানে আছি বলেই দায়িত্বটা বস্ আমাকে দিয়েছেন।'

'তুই কি আমাকে ব্রিফ করবি?' রানার গলায় অবিশ্বাস।

মাথা নাড়ল সলিল। 'না। বলতে পারিস তোকে আমি যুদ্ধের জন্যে সাজিয়ে দেব। প্রথমে তোর গাড়ি প্রসঙ্গে আসা যাক।'

একটা রশি ধরে টান দিল সলিল, প্রথম বাক্সটার সামনের অংশ একপাশে সরে গেল, ভেতরে দেখা গেল খাঁচায় বন্দী মস্ত একটা জাগুয়ার। জানোয়ারটা বিকট শব্দে রানার উদ্দেশে খেঁকিয়ে উঠল, শুনে ওর আত্মার পানি শুকিয়ে যাওয়ার অবস্থা হলো।

হা-হা করে হেসে উঠল সলিল। ‘রঙ অ্যাসাইনমেন্ট। সরি, দোস্ত।’

ঢিল পড়ল রানার পেশীতে, ও-ও হাসল।

দ্বিতীয় বাক্সটার দিকে এগোল সলিল। কিন্তু রানা দেরি করছে, তাকিয়ে আছে এখনও জাগুয়ারের দিকে। ওর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে শান্ত হয়ে গেল জানোয়ারটা।

বন্ধুকে পেয়ে বক বক করছে সলিল, প্র্যাকটিকাল জোক থেকে অঢেল মজা পেয়েছে। রানাকে চমকে দেয়া অত্যন্ত কঠিন, তবে সফল হলে প্রতিবারই স্মরণীয় হয় ঘটনাটা। ‘আয়, আরেকবার চেষ্টা করি,’ বলল সে, তারপর দ্বিতীয় বাক্সটার সামনে দাঁড়িয়ে আরেক প্রস্থ রশি ধরে টান দিল। বাক্সটার চারটে দিকই খসে পড়ল মেঝেতে, উন্মোচিত হলো নতুন মুদ্রার মত চকচকে ঝকঝকে একটা গাড়ি।

‘আনকোরা নতুন বিএমডব্লিউ সাতশো পঞ্চাশ। যা যা থাকার তা তো আছেই, আরও আছে মেশিন গান, রকেট...’

‘সিডি প্লেয়ার আছে?’ বাধা দিয়ে জানতে চাইল রানা।

সলিল বলে যাচ্ছে, রানার কথা যেন শুনতেই পায়নি, ‘...জিপিএস ট্র্যাকিং ও...’ গাড়ির দরজাটা খুলল রানা। ‘... বিশেষ করে এটার জন্যে আমি খুবই গর্বিত।’

ইংরেজিতে কথা বলছে, তবে বাচনভঙ্গি জার্মান, বেরিয়ে এল গোপন স্পীকার থেকে, ‘ওয়েলকাম টু বিএমডব্লিউ’স নিউ ভয়েস অ্যাসিসটেড নেভিগেশন সিস্টেম।’

রানা দরজা বন্ধ করতে আওয়াজটা থেমে গেল। সিলভার কালার গাড়িটা খুবই পছন্দ হলো ওর। পালিশ করা কাঠের একটা

ছোট বাক্স খুলল সলিল। ভেতরে ভেলভেটের ওপর শুয়ে রয়েছে নতুন একটা ওয়ালথার পি নাইনটিনাইন হ্যান্ডগান। সলিল বলল, ‘এটা একটা হ্যামারলেস পিস্তল, সিঙ্গেল ও ডাবল-অ্যাকশন- জার্মান পুলিস ব্যবহার করে।’

হাতে নিয়ে জিনিসটা পরীক্ষা করল রানা।

‘ফ্রেম ও অন্যান্য পার্টস হাই কোয়ালিটি পলিমার দিয়ে তৈরি। ম্যাগাজিনে ষোলোটা বুলেট ধরে, চেম্বারে অতিরিক্ত একটা রাউন্ড থাকে।’ রানার হাতে একটা সেল ফোন ধরিয়ে দিল সলিল। ‘এবার এটার কথা বলি।’ কালো রঙের ফোন, এরিকসন মডেল। ‘বৈশিষ্ট্য হলো, ইনফ্রারেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার আছে, আছে টোয়েনটি-থাউজ্যান্ড-ভোল্ট সিকিউরিটি সিস্টেম, বিচ্ছিন্ন করা যায় এমন অ্যান্টেনা, ভিডিও ক্যামেরা ও স্টান-গান। এটা আবার তোর নতুন গাড়ির রিমোট কন্ট্রোলও।’ সেল ফোনের একটা বোতামে চাপ দিল সে, একটা বইয়ের মত খুলে গেল ওটা। ‘দু’বার চাপ দিবি,’ বলে নিজেই দু’বার চাপ দিল। ওদের পিছনে বিএমডব্লিউ স্টার্ট নিল। চালু এঞ্জিন নির্দেশ পাবার জন্যে অপেক্ষা করছে।

এরপর অত্যন্ত সাবধানে টাচ স্ক্রীনের ওপর আঙুল বুলাল সলিল। ‘এই প্যাডে যেভাবে তুই আঙুল বুলাবি সেভাবে মুভ করবে গাড়ি।’ আঙুল বুলিয়ে দেখাচ্ছে সে। রিভার্সে চলে গিয়ে ধীরে ধীরে পিছু হটছে বিএমডব্লিউ। আঙুলটা উল্টোদিকে সরাল সলিল। গিয়ার বদলে গেল, কয়েকবার মৃদু ঝাঁকি খেয়ে সামনে বাড়ল গাড়ি। স্ক্রীন থেকে আঙুল তুলে নিল সে, সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল কার। ‘বাইরে থেকে গাড়িটা ড্রাইভ করা অত্যন্ত কঠিন, তবে চর্চা করলে…’

‘দেখা যাক আমার ছোঁয়ায় কেমন সাড়া দেয়,’ বলল রানা।

চাকার সঙ্গে পাকা মেঝে ঘষা খাওয়ায় কর্কশ আওয়াজ হলো। সবেগে পিছন দিকে ছুটল বিএমডব্লিউ, একটা বাক্সকে ঘিরে বৃত্ত তৈরি করল, তারপর লাটিমের মত একটা পাক খেয়ে সলিল আর রানার দিকে ছুটে এল। হঠাৎ থামল গাড়িটা, ওদের হাঁটু থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে।

সুইচ টিপে এঞ্জিন বন্ধ করল রানা, ঠোঁটের কোণে তৃপ্তির হাসি। সলিলের চেহারা সাদা হয়ে গেছে।

ফাউলার মিডিয়া গ্রুপ নেটওঅর্ক কমপ্লেক্সের সামনে সার্চলাইটের উজ্জ্বল আলো ছুটোছুটি করছে। সুদৃশ্য ভবনের চত্বরে বাঁকা চাঁদের আকৃতি নিয়ে দাঁড়িয়েছে একদল ভ্যালিট। দামী গাড়ির লাইন ধীরগতিতে এগোচ্ছে। অভিজাত, ধনী ও বিখ্যাত ব্যক্তিরা আমন্ত্রণ পেয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছেন। সারা দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকা থেকে এসেছেন মিডিয়া প্রফেশনাল, ডিপ্লোম্যাট, ব্যবসায়ী, আর্টিস্ট, কলাম লেখক, এমন কি রক স্টারও। এফএমজিএন হামবুর্গে তাদের নতুন হেডকোয়ার্টার খুলতে যাচ্ছে।

একজন ভ্যালিটের সামনে নিজের বিএমডব্লিউটা দাঁড় করাল রানা। ভ্যালিট দরজা খুলে দিল। নিচে নেমে জার্মান ভাষায় তাকে রানা বলল, ‘ওকে তোমার ওপর মাতব্বরি করার সুযোগ দিয়ো না।’

হতভম্ব ভ্যালিট গাড়িতে উঠে প্রস্তুতি নিচ্ছে, গ্যারেজে নিয়ে যাবে। গাড়ির নারীকণ্ঠ বলে উঠল, ‘সীটবেল্ট বাঁধুন, হুজুর।’

বিল্ডিঙের ভেতর জমে উঠেছে পার্টি। হালকা বাদামী রঙের স্যুট পরেছে রানা, দরজায় দাঁড়ানো একটা মেয়ের হাতে ইনভিটেশন-কার্ডটা ধরিয়ে দিল। কার্ডে চোখ বুলিয়ে মিষ্টি করে হাসল মেয়েটা। 'ওয়েলকাম, মি. রানা। এদিক আসুন, প্লীজ...' পথ দেখিয়ে রানাকে মেইন হলরূমে নিয়ে এল সে। নানা রকম ব্যানার দিয়ে সাজানো হয়েছে ঘরটাকে। বাম দিকের ব্যানারে 'আগাম খবর'-এর লোগো দেখা যাচ্ছে, ডান দিকের ব্যানারে এফএমজিএন-এর লোগো। দুটোতেই ম্যাডক ফাউলারের ছবি আছে। তারপর রানা যেদিকেই তাকাল, লক্ষ করল কোন না কোনভাবে ফাউলারের ছবিই শুধু প্রদর্শিত হচ্ছে।

বিশাল বিল্ডিংটা ধাতব সেতুর সাহায্যে আরও দুটো বিল্ডিঙের সঙ্গে যুক্ত। ডিজাইন বা নকশার মধ্যে স্ব-প্রচারের একটা ভাব স্পষ্ট। ফাউলারের টাকা আছে, সে তা উপভোগ ও প্রচার করতে ভালবাসে।

মেয়েটা ওকে আরেক লোকের হাতে ছেড়ে দিল। লোকটার পরনে জ্যাকেট, দেখে মনে হলো পাবলিক রিলেশন্স অফিসার। এক সুন্দরী চীনা মেয়ের সঙ্গে কথা বলছিল সে। চীনা হলেও, জাপানী পুতুলের মত নিখুঁত মেয়েটা, অপরূপ সুন্দরী। দীর্ঘ, রূপোলি রঙের একটা ড্রেস পরেছে। তাকাবার পর রানা তার ওপর থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না। এবার মেয়েটাও তাকাল। সে-ও চোখের পাতা ফেলছে না।

লোকটা বলল, 'হামবুর্গে স্বাগতম, মি. রানা।' আগেই রানার কার্ডের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়েছে সে। 'আমি জ্যাক ফনটন, এখানকার পিআরও।' রানার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল সে। হাতে

সামান্য ব্যথা পেয়ে রানার ধারণা হলো, লোকটা শুধু পাবলিক রিলেশন্স অফিসার নয়, সম্ভবত বডিগার্ডও। ফনটন তখনও বলছে, 'ধারণা করছি এরই মধ্যে আপনাদের পরিচয় হয়েছে, আপনারা যেহেতু পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী।'

'না, সে আনন্দ থেকে এখনও আমি বঞ্চিত,' বলল রানা। মেয়েটার দিকে তাকিয়ে হাসি ফোটাল চোখে। 'আমি মাসুদ রানা।'

হ্যান্ডশেক করল ওরা। মেয়েটা বলল, 'আমি লীনা ওয়াং। খুশি হব লীনা বলে ডাকলে। ব্যাংক অভ হঙকঙে আছি। আপনি...?'

'ব্যাংক অভ ইংল্যান্ডে,' জবাব দিল রানা। কাভারটাকে নিরাপদই বলা যায়, কারণ সম্প্রতি ফাইন্যান্স সম্পর্কে বেশ আগ্রহী হয়ে উঠেছে ও। টাকা-পয়সা সংক্রান্ত যে-কোন আলোচনায় উতরে যেতে পারবে। মেয়েটাকে এতক্ষণে খুঁটিয়ে লক্ষ করছে ও। আকারে একটু ছোটখাট হলেও, হাবভাবে কর্তৃত্ব আর আত্মবিশ্বাস যথেষ্ট। ছাব্বিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে বয়েস। ব্যাংকার হিসেবে ঠিক যেন মানায় না, বড়বেশি সুন্দর আর সেক্সি। মেয়েটার মধ্যে বিপজ্জনক কি যেন একটা আছে বলে সন্দেহ হলো ওর। তবে অস্বস্তির সঙ্গে কৌতূহলও বাড়ল।

রানাকে খুঁটিয়ে দেখে লীনাও সিদ্ধান্তে পৌঁছুল, এই লোক ব্যাংকার হতে পারে না। চোখ দুটো কালো আর মায়াময়, কিন্তু তাসত্ত্বেও নিষ্ঠুর বা কঠিন এমন একটা কিছু আছে ওখানে যে ভয়ের একটা ভাব জাগে মনে। এতটা সুঠাম স্বাস্থ্য, দাঁড়াবার ঋজু ভঙ্গি, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি কোন ব্যাংকারের হতে পারে না। 'এই লোক নিষ্ঠুর' বলে চিৎকার করছে ডান ভুরুর কাছে কাটা দাগটা।

তাছাড়া, বড় বেশি নির্লিপ্ত আর ঠাণ্ডা। লোকটা সম্ভবত গোয়েন্দা টাইপের কিছু হবে, ধারণা করল সে। তারপর ভাবল, নাকি আমারই মত ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট?

'চলুন, আপনাদেরকে মি. ফাউলারের কাছে নিয়ে যাই,' বলল ফনটন। 'উনি আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন।' ভিড়ের মধ্যে দিয়ে পথ করে এগোল ওরা। লাল জ্যাকেট পরা আরও বেশ কয়েকজন অফিসারকে দেখতে পেল রানা, ধারণা করল লোক-গুলো আসলে 'সিকিউরিটি গার্ড'।

'ব্যাপারটা দারুণ না? প্রথমে সব কিছু আলাদা ছিল- ফ্রন্ট অফিস বিল্ডিং ছিল আমাদের পিছনে, বাম দিকে ছিল নিউজপেপার প্ল্যান্ট, আর ডান দিকে ছিল স্যাটেলাইট নেটওঅর্ক। এখন সব এক করা হয়েছে, একই ছাদের নিচে।'

'হোক একই ছাদ, আমার কাছে বিশাল এক তাঁবুর মত লাগছে,' মন্তব্য করল রানা।

'যদি তাঁবু হয়ও,' হেসে উঠে বলল ফনটন, 'এই তাঁবুর বৈশিষ্ট্যই হলো পুরস্কার পাওয়া।'

এক ও দু'তলার মাঝখানের একটা স্তরে ফাউলারকে পেল ওরা, অতিথিরা ঘিরে রেখেছে। সবুজ ও সোনালি রঙের কাজ করা সিল্কের একটা ঢোলা আলখেল্লা পরে আছে সে, ডিজাইনটা সম্ভবত জাপানীদের কাছ থেকে ধার করা। লোকটা হাসিখুশি, চেহারায় ব্যক্তিত্ব ও আভিজাত্য আছে, দেখে বোঝার উপায় নেই ব্রিটিশ নাবিকদের খুন করার জন্যে সে দায়ী হতে পারে। 'মি. ফাউলার,' সবিনয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল ফনটন। 'ইনি মি. মাসুদ রানা, আর ইনি মিস লীনা ওয়াং।'

ওদের দিকে ফিরে আন্তরিক হাসি হেসে ফাউলার বলল, 'ও, হ্যাঁ, আপনারা নতুন ব্যাংকার!' অতিথিদের দিকে ফিরে সকৌতুকে চোখ মটকাল। 'ব্যাংক প্রসঙ্গে বলতে হয়, সংখ্যায় কয়েকশো হবে- আমি ওগুলোর মালিক।' গ্রুপের সবাই হেসে উঠল, তবে সুরটা আড়ষ্ট। রানার দিকে আবার ফিরে জানতে চাইল, 'আপনারা কি একসঙ্গে এসেছেন?' হাত বাড়াল ওর দিকে।

'আসতে পারলে খুশি হতাম,' জবাব দিল রানা। 'ওঁর সঙ্গে আমার নিচে দেখা হয়েছে।' ফাউলারের হাতে কঠিন একটা চাপ দিয়ে ছেড়ে দিল ও।

'বলুন তো, মি. রানা। সঙ্কট শুরু হবার পর বাজারের প্রতিক্রিয়া কি?'

'কারেন্সি মান হারালেও আপনার স্টক বাড়ছে।'

ওদের সঙ্গে যোগ দিল আমেরিকান একটা মেয়ে। শ্বাসরুদ্ধকর দেহ-সৌষ্ঠব, তবে উজ্জ্বল হাসির আড়ালে লুকিয়ে আছে বিষণ্নতা। গাঢ় খয়েরী রঙের চুল কাঁধ পর্যন্ত লম্বা। মায়াভরা হরিণীর চোখ, তা-ও খয়েরী। লো-কাট কালো ড্রেস পরেছে, লীনা ওয়াঙের মতই দৃষ্টি কাড়ে। উন্মুক্ত গলায় হীরে বসানো নেকলেসটা আলোর দ্যুতি ছড়াচ্ছে। মেয়েটার বয়েস হবে আঠাশ কি ঊনত্রিশ। স্মিত হেসে বাউ করল ফনটন, দল থেকে বেরিয়ে নিজের কাজে ফিরে গেল।

'ওহ্, ডার্লিং,' আমেরিকান মেয়েটিকে বলল ফাউলার। 'এসো, আমার নতুন বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি ব্যাংক অব হঙকঙের মিস লীনা ওয়াং...' মেয়েটার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল লীনা। ফাউলার রানার দিকে ফিরল, কিন্তু ওর সঙ্গে সে নিজের স্ত্রীর পরিচয় করিয়ে দেয়ার আগেই ঠাস করে জোরাল একটা শব্দ

হলো।

আশপাশে উপস্থিত সবাই আওয়াজটা শুনে থেমে গেছে, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল এদিকে। চোখে তীব্র ক্ষোভ আর ঘৃণা নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে রয়েছে পামেলা ফাউলার। আর রানা, সামান্য বিব্রত, একটা হাত তুলে নিজের বাম গালটা হালকাভাবে স্পর্শ করল।

'আমার স্ত্রীকে আপনি আগে থেকেই চেনেন, মি. রানা?' জানতে চাইল ফাউলার, হতভম্ব দেখাচ্ছে তাঁকে। ব্যাখ্যা চাওয়ার ভঙ্গিতে ঘন ঘন দু'জনের দিকে তাকাচ্ছে।

'চিন্তা কোরো না, ডার্লিং,' বলল পামেলা। 'তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবার আগেই মাসুদ রানা আমার কাছে প্রাচীন ইতিহাস হয়ে গেছে।' লীনার দিকে ফিরল সে। 'তোমাকে কিছু বুঝতে না দিয়ে ওকে চড় মারায় সত্যি আমি দুঃখিত, তবে তুমি যদি ওর সঙ্গে দশ মিনিটের বেশি মিশে থাকো, কারণটা ঠিকই বুঝে নিতে পারবে।'

'আসলে, দশ মিনিটও হয়নি ওর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে আমার,' বলল লীনা, রানা সম্পর্কে তার কৌতূহল আরও বেড়ে গেল।

'তাহলে চলো, তোমাকে কিছু গল্প শোনাই।' পুরুষদের দিকে ফিরল পামেলা। 'নাকে পাফ বুলিয়ে আসি।' লীনার হাত ধরে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল সে।

রানাকে তীক্ষ্ণ চোখে দেখছে ফাউলার। 'আমার স্ত্রী খুব মেজাজী মহিলা।'

'হাতে জোরও খুব,' জবাব দিল রানা।

'চার্লস রাইডার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল।'

চার্লস রাইডার ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের ভাইস-প্রেসিডেন্ট। 'এখন তিনি আগের চেয়ে ভাল আছেন,' মিথ্যে কথা বলল রানা। 'উনি আপনাকে গুজবে কান দিতে বারণ করেছেন।'

'গুজব?'

'অর্থহীন। ভিত্তিহীন। একদম কান দেবেন না।'

'আমি কৌতূহলী।'

'ইয়ে, মানে, লোকে বলছে যে,' ম্লান সুরে শুরু করল রানা, 'লন্ডন থেকে হামবুর্গে আর হঙকঙ থেকে ইন্দোনেশিয়ায় সরে আসার জন্যে আপনি যে মিলিয়ন মিলিয়ন পাউন্ড খরচ করছেন তা নাকি ব্যবসার খাতিরে নয়। এর আসল কারণ চীনাদের আপনি ঘৃণা করেন তারা হঙকঙ ফিরিয়ে নিচ্ছে বলে, আর ব্রিটিশদের ঘৃণা করেন তারা ফিরিয়ে দিচ্ছে বলে।'

'উদ্ভট।'

'তারপর লোকে বলাবলি করছে আপনার স্যাটেলাইট সিস্টেম এত লোকসান দিচ্ছে যে নিউজ বিজনেস থেকে আপনাকে বোধহয় সরে আসতে হবে। এ-ও শোনা যাচ্ছে যে আপনি স্যাটেলাইট নেভিগেশন থেকে কিছু আয় করা যায় কিনা ভেবে দেখছেন।'

'নেভিগেশন!' ফাউলারের সারা শরীরে রক্ত যেন ছলকাতে শুরু করল। এই লোক এ-সব কি বলছে?

'অর্থহীন গুজব, আগেই বলেছি,' বলল রানা। 'নেভিগেশনে টাকা নেই। কি, আছে?'

‘আমার তা জানার কথা নয়,’ ফাউলার বলল। ‘আর কোন গুজব, মি. রানা?’

‘এটা সবচেয়ে বিদঘুটে…লন্ডন ছাড়ার পিছনে আসল কারণ নাকি আপনি একজন ব্যারন হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ওরা আপনাকে এমন কি “স্যার ফাউলার” বানাতেও রাজি নয়।’

রানার দিকে তাকিয়ে থাকল ফাউলার। অনুভব করল চোয়ালের পেশী ব্যথা করছে। এই লোক কি মনে করে নিজেকে?

‘এ-সব বাজে প্রসঙ্গ থাক,’ বলল রানা। ‘আপনি বরং আপনার স্যাটেলাইট প্রসঙ্গে বলুন। দুনিয়া জুড়ে কোথায় না আপনি পজিশন নিয়েছেন। কিভাবে সম্ভব হলো জানার খুব আগ্রহ আমার।’

চেহারা দেখে বোঝা না গেলেও, চিন্তিত হয়ে পড়ছে ফাউলার। ‘স্যাটেলাইট সম্পর্কে নতুন করে কি বলার আছে। ওগুলো ইনফরমেশন সংগ্রহের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।’

‘কিংবা ডিজইনফর্মেশন। আচ্ছা, আপনি যদি কোন সরকারকে বা কোন দেশের জনগণকে, বা ধরুন একটা জাহাজকে দিকভ্রান্ত করতে চান?’ প্রশ্নটা করার সময় রানার চেহারায় শিশুসুলভ সরলতা ছাড়া আর কিছু থাকল না।

‘ইন্টারেস্টিং, মি. রানা,’ দু’সারি দাঁতের ফাঁক দিয়ে হিসহিস করে বলল ফাউলার। অতিথিদের সামনে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। ‘একজন ব্যাংকারের এমন রঙচঙে কল্পনাশক্তি আশা করা যায় না। আপনাকে বোধহয় একটা উপন্যাস লেখার জন্যে ভাড়া করা উচিত আমার।’

‘তাহলেই হয়েছে! সত্যি যদি লিখতে বলেন, মনে হবে সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি।’

ভুরু কোঁচকাল ফাউলার। কতটুকু কি জানে এই লোক?'

কোত্থেকে যেন ওদের পাশে উদয় হলো ফনটন, দু'জনের উত্তেজনা আঁচ করতে পেরেছে। ঝকমকে হাসি হেসে বলল, 'আপনাকে সরিয়ে নিতে হচ্ছে বলে দুঃখিত, মি. ফাউলার। একবার ওপরতলায় উঠতে হবে।'

রানার সামনে থেকে ফাউলারকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ফনটন, কিন্তু মিডিয়া সম্রাট নতুন প্রতিপক্ষের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, ভাবছে, এই লোক এত সাহস কোত্থেকে পায় যে আমাকে অপমান করে? লীনা ওয়াংকে নিয়ে ফিরে আসছিল পামেলা, দেখতে পেয়ে তাকেও ডাকল ফনটন, 'ভালই হলো আপনিও এসে গেছেন, মিসেস ফাউলার। আপনাদের দু'জনকেই একবার ওপরতলায় যেতে হবে...'

ফনটন আর স্ত্রীর সঙ্গে যাবার সময় রানাকে ফাউলার বলল, 'মার্ক টোয়েনের কথাটা কখনও ভুলবেন না, মি. রানা। উনি বলেছিলেন, যে লোক ব্যারেল ব্যারেল কালি কেনে তার সঙ্গে ঝগড়া করতে নেই।'

স্বামী ও রানার সঙ্গে কিছু একটা হয়েছে, বুঝতে পেরে নার্ভাস ভঙ্গিতে দু'জনের দিকে তাকাল পামেলা। তার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল ফাউলার, একটু জোরেই। রানার পাশে এসে দাঁড়াল লীনা।

'আমাদের ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে যায়নি তো, মি. রানা?' লীনার গলায় কৌতুক।

'সঞ্চয় বরং বেড়েছে,' জবাব দিল রানা। 'লেডিস রুমে খুব গল্প হলো, কি বলেন?'

‘আমি বিহ্বল।’

‘আমিও হতে চাই।’

‘নাহ্, সে কি বলার মত কথা?’

‘ইংরেজি আপনি খুব ভালই বলেন। শিখলেন কোত্থেকে? বাচনভঙ্গিতে কোন এলাকার টান বলুন তো, উত্তর চীন?’

‘আমেরিকায় লেখাপড়া শিখেছি না! উত্তর চীন নয়, সাংহাই।’

‘আর কি ভাষা জানেন আপনি?’

‘অনেক, মি. রানা। ফ্রেঞ্চ, জার্মান, রাশিয়ান, ইটালিয়ান, জাপানী, আঞ্চলিক কয়েকটা চীনা ভাষা। কেন?’

‘আপনার সঙ্গে আমার অনেক মিল। ও-সব ভাষা আমিও জানি। পেশাও এক। সত্যি কি এক?’

‘আমার কোন সন্দেহ নেই,’ বলে হাসল লীনা। ‘শুধু পেশাই বা বলি কেন, বোধহয় উদ্দেশ্যও এক।’

এই সময় ছোটখাট স্টেডিয়াম তুল্য হলরূমের আলো নিস্তেজ হয়ে এল, স্পটলাইটের আলো ফেলা হলো মাথার ওপর ঝুলন্ত সবচেয়ে উঁচু ব্রিজটার ওপর। ওখানে স্ত্রীকে পাশে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ম্যাডক ফাউলার। নিচের অতিথিদের উদ্দেশে হাত নাড়ল সে। বিল্ডিঙে উপস্থিত প্রায় সবাই আনন্দে মুখর হয়ে উঠল। স্বামী-স্ত্রী নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, তবে নিচে থেকে তা শুনতে পাবার কথা নয়।

‘ওই লোক, মাসুদ রানা,’ ফাউলার বলল, ‘তুমি তাকে ব্যাংকার হিসেবে চিনতে?’

‘হ্যাঁ।’ পলকের জন্যে ইতস্তত করায় স্বামীর মনে সন্দেহ জাগিয়ে তুলল পামেলা।

'কেউ মিথ্যে কথা বললে আমি ধরে ফেলি, ডার্লিং। ওকে তুমি চড় মারলে কেন?'

'ওটা ওর পাওনা ছিল।'

'এখন আমার কাছ থেকেও পাবে, তবে আরও কঠিন শাস্তি।'

ব্রিজে একটা মাইক্রোফোন সেট করা হয়েছে, ফাউলারকে সেদিকে এগোবার জন্যে ইঙ্গিত করল ফনটন। পামেলা পিছিয়ে এল, স্পটলাইটে একা রয়ে গেল ফাউলার।

উদ্বেগ ঝেড়ে ফেলে আবার হাসিখুশি আর আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে ফাউলার। তার কর্তৃত্বপূর্ণ ভরাট কণ্ঠস্বর বিল্ডিঙের ভেতর গমগম করতে লাগল, শ্রোতাদের সম্মোহিত করে ফেলছে। 'কথাটা মনে পুলক জাগায়, আপনারা হয়তো শুনেছেন- "ভবিষ্যতে পা ফেলার সেতু"। কিন্তু না, এ শুধু আমার একটা শ্লোগান নয়। এ এক অতি বাস্তব সত্য। আমি সেই সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে আছি! আমার ডান দিকে সারাদিনে চব্বিশ ঘণ্টা চালু থাকছে প্রিন্টিং মেশিনগুলো, ছাপা হচ্ছে দুনিয়ার প্রথম গ্লোবাল নিউজপেপার। বাম দিকে দুনিয়ার বৃহত্তম গ্লোবাল স্যাটেলাইট নেটওঅর্ক সেন্টারকে জায়গা ছেড়ে দিতে যাচ্ছি আমরা। আমি আপনাদেরকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, অষ্টাদশ শতকের টেকনলজির চরম উৎকর্ষ দেখুন, তারপর আমার সঙ্গে পা ফেলুন, ভবিষ্যতের সেতুতে, দেখুন ভবিষ্যৎ আমাদের জন্যে কি উপহার নিয়ে অপেক্ষা করছে...'

তুমুল করতালি শুরু হলো। তারপর অতিথিদের একটা মিছিল ঝুল-বারান্দায় জড়ো হলো, ওখান থেকে প্রেস সেকশনটা দেখা যায়। নিচে এক সারিতে অনেকগুলো পাঁচতলা সমান উঁচু

নিউজপেপার প্রিন্টিং প্রেস। ভিড় ঠেলে সামনে চলে এল রানা ও লীনা, নিচে চোখ বুলাল। রানার মন খুঁত খুঁত করছে, লীনাকে অন্য প্রসঙ্গে প্রশ্ন করল, 'হঙকঙে ব্যবসা-বাণিজ্য এখন কি রকম?'

'চীনের অধীনে? খুবই ভাল!' গর্বের সঙ্গে বলল লীনা।

অতিথিদের পিছু নিয়ে বিল্ডিঙটার টপ লেভেলে উঠে এল ওরা। ফাউলার ভবিষ্যতের সেতু বলছে বিশাল এক প্ল্যাটফর্মকে, সবাই জড়ো হলো তাতে। মাঝে মধ্যেই লীনা আর রানা পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে। দু'জনের মনেই সন্দেহ। লোকজনের সঙ্গে এফএমজিএন নিউজরূমে চলে এল ওরা। ওয়েটাররা এখানে শ্যাম্পেন ভরা গ্লাস সাধছে অতিথিদের। বড় আকৃতির একটা স্যাটেলাইট মডেলকে পাশ কাটিয়ে ওদেরকে পথ দেখাল একজন পাবলিক রিলেশন্স অফিসার। নিউজরূমে চলে এল সবাই। প্রকাণ্ড কামরাটা লাল ফিতে দিয়ে দু'ভাগ করা, কাল রাতে এখানে বসেই কবির আর ফাউলার নটিংহামের নাবিকদের হত্যাকাণ্ড চাক্ষুষ করেছে। এই মুহূর্তে কামরার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ফাউলার, তার চারপাশে টেলিভিশন ক্যামেরা বসানো হয়েছে। একজন মেকআপ গার্ল খুব ব্যস্ততার সঙ্গে তার চেহারার যত্ন নিচ্ছে, একটু পরই গোটা দুনিয়া জুড়ে তার জ্যান্ত ছবি প্রদর্শিত হবে। কামরার এক ধারে ঘুর-ঘুর করছে পামেলা। রানা আর লীনাকে ভেতরে ঢুকতে দেখছে ফাউলার, লক্ষ করল সে। হাতছানি দিয়ে ডিক মেনাচিমকে ডাকল ফাউলার। পামেলা মেনাচিমকে পছন্দ করে না। লোকটাকে দেখলেই ভয়ে তার গা শিরশির করে।

মেনাচিমের কানে কানে কি যেন বলছে ফাউলার, শোনার সময় রানার দিকে তাকাল জার্মান স্যাডিস্ট। ছোট্ট করে মাথা

ঝাঁকিয়ে ফাউলারের কাছ থেকে সরে গেল সে। সবই লক্ষ করল পামেলা।

অদৃশ্য সাউন্ড সিস্টেম থেকে ভেসে এল, 'লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলমেন, প্লীজ চুপ করুন। ব্রডকাস্ট শুরু হতে আর মাত্র ত্রিশ সেকেন্ড বাকি।'

মেনাচিমের ওপর নজর রাখছে পামেলা। মেনাচিম ওয়াকি-টকিতে কথা বলছে। পামেলার পাশে দাঁড়ানো একজন সিকিউরিটি গার্ড হঠাৎ হাত তুলল নিজের কানে। তাকে পামেলা বলতে শুনল, 'হ্যাঁ, মি. মেনাচিম, ওকে আমি দেখতে পাচ্ছি। বাদামী রঙের স্যুট পরে আছে। রানা?...ঠিক আছে, স্যার, ব্যবস্থা করছি।'

ভিড় ঠেলে এগোচ্ছে পামেলা, রানার দিকে যাচ্ছে। চারদিক থেকে গুঞ্জন উঠল, কারণ সব ক'টা মনিটরে ম্যাডক ফাউলারের জ্যান্ত ছবি ফুটে উঠেছে।

'দশ সেকেন্ড,' বুদের ভেতর থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'সবাই চুপ করুন, প্লীজ। ফাইভ, ফোর, থ্রী, টু, ওয়ান...'

কথা বলার জন্যে লীনার দিকে ফিরল রানা, কিন্তু ওর পাশে নেই সে। চারদিকে দ্রুত চোখ বুলাল ও, দেখল একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে মেয়েটা।

'গুড ইভিনিং,' মিডিয়া সম্রাট ক্যামেরার দিকে ফিরে বলল। 'আমি ম্যাডক ফাউলার। আজ রাতে আমরা পশ্চিম গোলার্ধের নতুন ব্রডকাস্ট ফ্যাসিলিটি উদ্বোধন করতে যাচ্ছি। এখানে, হামবুর্গে, আমাদের সঙ্গে অনুষ্ঠানে মিলিত হয়েছেন সম্মানীয় অতিথি বৃন্দ...'

একটা স্ক্রীনে অতিথিদের একাংশকে দেখানো হলো।

'...এবং একই সঙ্গে জাকার্তায়, আমাদের পশ্চিম গোলার্ধের হেডকোয়ার্টারে, এবং আমাদের আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহ যথা লস অ্যাঞ্জেলেস, নাইরোবি, তেলআবিব, মস্কো, নতুন দিল্লী...'

ফাউলার যে-সব শহরের নাম বলছেন, বিভিন্ন মনিটরে সে-সব দেশের ফ্যাসিলিটি থেকে আসা প্রতিনিধিদের ছবি আসছে।

রানার পাশে এসে দাঁড়াল পামেলা, ফিসফিস করে বলল, 'এমন কিছু বলেছ যা শুনে আমার স্বামী আপসেট হয়ে পড়েছে। আমি চাই এখুনি তুমি এখান থেকে চলে যাও।'

'কিন্তু পার্টিটা যে আমার ভাল লাগছে,' বলল রানা।

'আমি সিরিয়াস, রানা। ওকে তুমি চেনো না। কিছু একটা করতে যাচ্ছে ও। হয়তো ঠ্যাং ভেঙে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবে। বিপজ্জনক সব লোক সারাক্ষণ ঘিরে রাখে ওকে। সুদর্শন জার্মান লোকটাকে দেখেছ? আমার ধারণা ও একটা খুনী।'

অনুষ্ঠানে আসার খানিক পরই মেনাচিমকে লক্ষ করেছে রানা। ওরও মনে হয়েছে, লোকটা সুস্থ নয়। ফিসফিস করে পামেলাকে বলল, 'সন্দেহ করা হচ্ছে তোমার স্বামী ভয়ানক কোন ক্রাইমে জড়িয়ে পড়েছে। আমার ঠ্যাং ভাঙার চেষ্টা করা হলে বুঝতে হবে সন্দেহটা মিথ্যে নয়।'

'কি ধরনের ক্রাইমের কথা...সেরেছে! বললাম চলে যাও... এখন কি হবে?'

ওদের দিকে এগিয়ে আসছে একজন গার্ড।

বক্তৃতা বন্ধ করেনি ফাউলার, তবে স্ত্রী ও রানার দিকে তাকিয়ে আছে। '...পরিস্থিতি খুবই জটিল। ব্রিটিশরা মনে করছে একজোড়া চীনা মিগ দক্ষিণ চীন সাগরে এইচএমএস নটিংহামকে ডুবিয়ে

দিয়েছে। সত্যি ডুবিয়ে দিয়েছে কিনা জানার জন্যে ব্রিটেন তাদের জাহাজ বহরকে পাঠাচ্ছে। তাদের এই সিদ্ধান্ত আমরা প্রশংসা না করে পারি না। আত্ম-মর্যাদা আছে এমন একটা জাতি মার খেয়ে তা হজম করবে কেন। অপরদিকে চীনারা মনে করছে তাদের মিগ দুটোকে গুলি করে নামিয়েছে নটিংহাম। কাজেই তারা যদি নিজেদের উপকূলে ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজকে ঢুকতে না দেয়, আমরা বিস্মিত হব না...'

গার্ড বলল, 'মাফ করবেন, মি. রানা। আপনার টেলিফোন।'

প্রথমে কথা বলল পামেলা, 'মি. রানাকে এই মুহূর্তে বিরক্ত করা উচিত হবে না।'

'দুঃখিত, ম্যাডাম। ওরা বলল কলটা খুব আর্জেন্ট।'

রানার বাহু আঁকড়ে ধরল পামেলা। 'যেয়ো না। নিশ্চয়ই কোন দুঃসংবাদ।'

'আমারও তাই ধারণা,' বলল রানা। 'কিন্তু না গেলে কি হবে, দুঃসংবাদ ঠিকই আমার নাগাল পেয়ে যায়।' আশ্বস্ত করার জন্যে পামেলার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে গার্ডের সঙ্গে এগোল ও।

ফাউলার বলে চলেছে, 'ঘটনাটা দুঃখজনক, কোন সন্দেহ নেই, তবে উত্তেজক একটা খবরও বটে। এবং আমি গর্বের সঙ্গে জানাচ্ছি যে এই সংকট সম্পর্কিত প্রতিটি নতুন খবর আমরাই বিশ্ববাসীকে সবার আগে জানাব।'

আবার তুমুল করতালি শুরু হলো। ফাউলার তৃপ্তির হাসি হাসছে, বিশেষ করে তার গার্ড রানাকে নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে। সে তার ভাষণ এখনও শেষ করেনি।

নিউজরুম থেকে বেরিয়ে এসে গার্ডকে অনুসরণ করছে রানা।

প্লাটফর্ম হয়ে প্রেস রূমে চলে এল ওরা, রানা জিজ্ঞেস করল, ‘ওদিকে কোন ফোন নেই?’

গার্ডের হাতে একটা ব্রাউনিং নাইন এমএম সেমি-অটোমেটিক বেরিয়ে এল। ‘আমরা ভাবলাম এখানে, এই অফিসে আপনি বেশি আরাম পাবেন।’

চার

'প্রেস ম্যানেজার' লেখা একটা কামরায় রানাকে ঠেলে দিল গার্ড। ক্যামকর্ডার হাতে দ্বিতীয় গার্ডকে দেখল রানা, ভিডিওটেপে ওর ছবি তুলছে। আরেক গার্ড, অকস্মাৎ ছুটে এসে হকিস্টিক দিয়ে বাড়ি মারল ওর পেটে। প্রচণ্ড ব্যথায় কুঁজো হয়ে গেল ও, প্রথম গার্ডের লাথি খেয়ে ছিটকে পড়ল মেঝেতে। ব্যথা আর অপমান বাড়িয়ে তুলল এক কোণে লুকিয়ে থাকা চতুর্থ গার্ড, সে-ও বেরিয়ে এসে ওর পাঁজরে লাথি কষল।

চতুর্থ গার্ড বলল, 'মি. ফাউলারের ধারণা আপনি ব্যাংকার নন। আর আমাদের ধারণা, হকিস্টিক দিয়ে আচ্ছামত পেঁদানো হলে ঠিকই আপনি মুখ খুলবেন।'

ভিডিও ক্যামেরা নিয়ে দ্বিতীয় গার্ড আরও খানিক সামনে এগিয়ে এল। পরমুহূর্তে আবার হকিস্টিক পড়ল রানার পেটে। ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখছে রানা, তারপরও পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টায় চারদিকে দৃষ্টি বুলাচ্ছে। কামরাটা তেমন বড় নয়। এক সেট সোফা, একটা গ্লাস ডেস্ক, একজোড়া চেয়ার, দুটো ফাইলিং

কেবিনেট। চারজন লোক। পিস্তল বেরিয়েছে মাত্র একটা। হকিস্টিকও একটা। দুই সেকেন্ডের মধ্যে ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেলল ও।

'সত্যি কথা বলবেন, আপনি কি ব্যাংকার?' জিজ্ঞেস করা হলো ওকে।

পেটে এখনও আগুন জ্বলছে, চোখ-মুখ কুঁচকে রানা বলল, 'না, আমি অ্যাসট্রোনট।'

চতুর্থ গার্ড লাথি মারার জন্যে পা ছুঁড়ল, তবে এবার রানা তৈরি ছিল। ওর নড়ে ওঠায় সাপের ছোবল মারার গতি। লোকটার পা তো ধরলই, সেটাকে বন্দীও করল বগলের নিচে, তারপর নিজের একটা পা ছুঁড়ল দ্বিতীয় গার্ডের ক্যামকর্ডার লক্ষ্য করে। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল লোকটা, হাত থেকে ক্যামেরাটা ফেলে দিয়ে খামচে ধরল একটা চোখ, কারণ ক্যামেরার আইপীস ভেতরে ঢুকে গেছে। শূন্যে থেকে ক্যামেরাটা লুফে নিল রানা, ছুঁড়ে মারল প্রথম গার্ডের মুখে, হাতের পিস্তল ছেড়ে দিয়ে পড়ে গেল সে, জ্ঞান হারিয়েছে।

তৃতীয় গার্ড রানাকে খোলা টার্গেট হিসেবে পেয়ে গেল। সময়ের অপচয় না করে হকিস্টিক চালাল সে, অস্ত্রটা সরাসরি রানার মুখে নামিয়ে আনছে। শরীরটাকে বাম দিকে গড়িয়ে দিল রানা, ফলে ওর বগলের নিচে পা আটকে আছে যে গার্ডের, হকিস্টিকের সামনে পড়ে গেল সে। নাক আর কপাল চুরমার হয়ে গেল তার, অজ্ঞান শরীরটা রানার ওপর ঢলে পড়ল।

তিন সহকর্মী অচল হয়ে পড়ায় হাতের হকিস্টিক ফেলে দিয়ে পিস্তল ধরতে গেল তৃতীয় গার্ড। কিন্তু অজ্ঞান গার্ডকে গায়ের ওপর

থেকে সরিয়ে ফেলল রানা, দেখা গেল ওর হাতে ওয়ালথার পি নাইনটি নাইনটা বেরিয়ে এসেছে। স্থির হয়ে গেল লোকটা।

‘গুলির শব্দ হলে এত সাধের পার্টি ভেঙে যাবে। মি. ফাউলার কি তোমাকে আদর করবেন? অবশ্য তোমার কিছু এসে যাবে না, কারণ তুমি তো মারাই যাবে।’

লোকটা নড়ছে না।

‘তারমানে এসে যায়। সেক্ষেত্রে পিস্তলটা সোফার ওপর ছুঁড়ে দাও।’

রানার নির্দেশ পালন করল লোকটা। পিস্তলটা ডান হাত থেকে বাম হাতে নিল রানা, খালি হাতটা লম্বা করল গার্ডের দিকে। ‘বসতে সাহায্য করো।’

হাত বাড়াল গার্ড। তার কব্জিটা চেপে ধরল রানা। পা দিয়ে লোকটার জুতোর ওপর শক্ত হাড়ে আকস্মিক চাপ দিল, সেই সঙ্গে হ্যাঁচকা টান দিল হাতটায়। রানার ওপর দিয়ে উড়ে গেল লোকটা, পড়ল গ্লাস ডেস্কে, সেটা বিস্ফোরিত হলো। ধীরে ধীরে, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে সিধে হলো রানা। প্রথম গার্ড নড়তে শুরু করেছে দেখে মাথার পাশে লাথি মারল, মেঝে থেকে তার পিস্তলটা তুলে রেখে দিল পকেটে। আবার ঝুঁকল ও, গার্ডের কোমরে আটকানো ওয়াকি-টকি থেকে এয়ারফোন জ্যাকটা খুলে নিল। কথাবার্তা শুনে মনে হলো রুটিন, গার্ড কাউকে সতর্ক করার সময় পায়নি।

দরজা খুলে বাইরে তাকাতে যাবে রানা, ওকে ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল লীনা ওয়াং, হাতে একটা মাস্টার কী। কামরার মেঝেতে এতগুলো লোককে পড়ে থাকতে দেখে বিস্ফারিত হয়ে গেল তার চোখ। রানা তাকে জিজ্ঞেস করল, ‘আপনার হাতে

জাদুর কাঠি?'

রানার হাতে ধরা পিস্তলটার দিকে একবার তাকাল লীনা, বলল, 'আপনার হাতেও তো মানুষ মারার লাঠি।'

ওয়াকি-টকি থেকে যান্ত্রিক আওয়াজ ভেসে এল, 'সিকিউরিটি! আর্জেন্ট! প্রেস ম্যানেজারের কামরায় তোমরা কে আছ, সাড়া দাও।'

লীনাকে আরও একটু ভেতরে টেনে নিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা। বিধ্বস্ত গ্লাস ডেস্কের আবর্জনা থেকে সিগারের একটা বাক্স তুলে নিয়ে দ্বিতীয় একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। দরজাটা খুলে সাবধানে ভেতরে ঢুকল ওরা। নিজের লাইটার জ্বেলে একটা চুরুট ধরাল রানা।

'মন্দ নয়,' বলল লীনা। 'আপনি ধোঁয়া গিলুন, আর আমি চিন্তা করি কিভাবে এখান থেকে পালানো যায়।'

'অতিথিরা যখন বেরিয়ে যাবে, তাদের সঙ্গে মিশে যাব আমরা।'

'কিন্তু ওদের বেরুতে আরও কয়েক ঘণ্টা দেরি আছে।'

'আমি আপনার সঙ্গে একমত নই,' বলে হাতের জ্বলন্ত চুরুটটা উঁচু করে স্মোক ডিটেকটরের সামনে ধরল রানা, অপেক্ষা করছে।

ওদিকে, এফএমজিএন নিউজরুমে, ফিতে কাটার জন্যে বিশাল এক কাঁচি হাতে প্রস্তুত হয়েছে ফাউলার। এই সময় ফায়ার অ্যালার্ম বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সাদা পাউডারের মেঘ খসে পড়তে শুরু করল সিলিং থেকে।

কামরায় উপস্থিত সবাই আঁতকে উঠল। 'আগুন! আগুন!' বলে চিৎকার জুড়ে দিল অনেকে। নিউজরুমের সব ক'টা স্ক্রীন খালি

হয়ে গেল, এক মুহূর্ত পর ফুটল শুধু স্প্লীজ স্ট্যান্ড বাই’ লেখা মেসেজটা। প্রথমে হতভম্ব হয়ে পড়েছিল ফাউলার, এই মুহূর্তে তাকে প্রচণ্ড রাগে কাঁপতে দেখা যাচ্ছে, মারমুখো চেহারা নিয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। অ্যালার্ম বেল থামল, তার বদলে রেকর্ড করা যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ভেসে এল, ‘অটোমেটেড ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম অ্যাকটিভেট করা হয়েছে। লাল সাইন দিয়ে চিহ্নিত কাছাকাছি দরজার দিকে শান্তভাবে এগোন সবাই। আপনারা ফায়ার রিটারড্যান্ট পাউডার দেখতে পাচ্ছেন, তাতে আতঙ্কিত হবার কিছু নেই। ওই পাউডার মানুষ, পোষা প্রাণী বা ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্টের কোন ক্ষতি করবে না।’ একই ঘোষণা জার্মান ভাষাতেও প্রচার করা হচ্ছে।

লোকজন কাছাকাছি দরজার দিকে ছুটল। ভিড়ের মধ্যে স্ত্রীকে একবার দেখতে পেল ফাউলার। মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসি চাপার চেষ্টা করছে পামেলা।

বন্ধ অফিস দরজার বাইরে লোকজনের হৈ-চৈ শুনতে পাচ্ছে রানা ও লীনা। ‘চলুন, এবার বেরিয়ে পড়ি,’ লীনাকে বলল রানা। দরজা খুলে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল ওরা। সিলিং থেকে এখনও পাউডার ঝরছে, রেকর্ড করা কণ্ঠ থেকে ঘোষণাটাও থামেনি। রানা লক্ষ করল, প্রতিটি ফ্লোরে কয়েকজন করে সিকিউরিটি গার্ড চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে, যেন হন্যে হয়ে খুঁজছে কাউকে। জার্মান স্যাডিস্ট, মেনাচিম, ওদেরকে জরুরী নির্দেশ দিচ্ছে বলে মনে হলো। ভিড়ের মধ্যে ওকে ওরা দেখতে না পাবারই কথা, তবে বলাও যায় না। জ্যাকেটের কলারটা তুলে ঘাড় ঢাকল ও, ভান করছে চুলে যাতে পাউডার না লাগে।

লোকজনের চেহারার ওপর চোখ বুলাচ্ছে একজন গার্ড, তাকে পাশ কাটিয়ে এল ওরা। পাশ কাটাবার সময় রানার দিকে তাকাল লোকটা, সঙ্গে সঙ্গে লীনা বলে উঠল, 'আমার স্বামীর জন্যে এই পাউডার সাংঘাতিক অ্যালার্জিক। মি. ফাউলারকে বলবে, ওটা যেন তিনি বদলান।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বাকি লোকজনের দিকে মনোযোগ দিল গার্ড। দরজা পার হয়ে পেভমেন্টে বেরিয়ে এল ওরা। কমপ্লেক্সের বাইরে সিকিউরিটি গার্ডদের খুব ব্যস্ত দেখা গেল। লোকজনকে থামাতে চেষ্টা করে তারা বোঝাতে চাইছে, পার্টি এখনও শেষ হয়নি, আসলে ফলস অ্যালার্ম বেজে উঠেছিল। কিন্তু অতিথিরা এ-সব কথা কানে তুলছেন না, কাপড়চোপড় নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সবাই খুব রেগে আছেন, গজর গজর করতে করতে যে-যার গাড়িতে উঠে পড়ছেন।

অতিথিদের থামাবার জন্যে ফাউলার নিজেও কমপ্লেক্সের বাইরে বেরিয়ে এল। কিন্তু কোন লাভ হলো না। মেনাচিমকে দেখা গেল তার পাশে। 'স্যার, লোকটাকে কোথাও আমরা পেলাম না। এখনও ভেতরে তাকে খোঁজা হচ্ছে।'

মাথা ঝাঁকাল ফাউলার। এত রেগে আছে যে কথা বলতে পারছে না। চোয়ালে হাত ঘষছে সে। এই সময় স্ত্রীকে দেখতে পেল, একদল অতিথির সঙ্গে কথা বলছে। এগিয়ে এসে পামেলার হাত ধরল, টেনে আনল একটা পিলারের আড়ালে।

'হাত ছাড়ো! আমার লাগছে!' প্রতিবাদ করল পামেলা।

'তুমি ঠিক জানো, মি. রানা একজন ব্যাংকার?' কর্কশ সুরে জানতে চাইল ফাউলার।

‘হ্যাঁ!’ বলল পামেলা। ‘আগেই তো বলেছি। ছাড়ো!’

স্ত্রীকে ছেড়ে দিল ফাউলার। ‘কেন মনে হচ্ছে তুমি সত্যি কথা বলছ না?’

কনুইয়ের ওপর হাতটা ডলছে পামেলা, চোখে ঠাণ্ডা দৃষ্টি। ‘তুমিই জানো।’

চড় তুলেও নিজেকে সামলে নিল ফাউলার, লোকজনের সামনে স্ত্রীকে মারধর করাটা উচিত হবে না ভেবে।

‘তোমার কি হয়েছে বলো তো, ম্যাডক?’ জিজ্ঞেস করল পামেলা। ‘আগেও তোমাকে বহুবার বলেছি, মেনাচিম বা আর যাদের সঙ্গে তুমি মেলামেশা করছ তারা লোক ভাল নয়। অথচ...’

বড় করে শ্বাস টানল ফাউলার। ‘ওরা আমার সাংঘাতিক বাধ্য, পামেলা। অনুগত ভৃত্য বলতে পারো। আমি সব কিছুর ওপর বিশ্বস্ততা আর আনুগত্যকে মূল্য দিই। তোমাকে আমি কথাটা বিশেষভাবে মনে রাখতে বলছি।’

‘আমিও তোমাকে মনে রাখতে বলব যে স্বামীকে বিপথগামী হতে দেখলে পামেলা চুপ করে থাকবে না।’

স্ত্রীকে ঠাস করে চড় মারল ফাউলার। কার কি প্রতিক্রিয়া হলো দেখার জন্যে দাঁড়াল না, রানাকে খোঁজার জন্যে অন্য দিকে চলে গেল। অপমানিতা পামেলার চোখে পানি বেরিয়ে এল, স্বামীর গমন পথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ভাবছে, এত অল্প সময়ের ভেতর লোকটা এভাবে বদলে গেল কিভাবে? আজকাল প্রায়ই তার গায়ে হাত তুলছে কোন কারণ ছাড়াই। রানা তখন বলল, ওর স্বামী সম্ভবত ভয়ানক কোন ক্রাইমে জড়িয়ে পড়ছে। কথাটা কতটুকু সত্যি? সিকিউরিটি গার্ড হিসেবে যাদেরকে চাকরি দেয়া

হয়েছে তাদের একজনকেও ভাল মানুষ বলে মনে হয়নি ওর। আর মেনাচিমকে তো বিভীষিকা বললেই হয়। আসলে কি ঘটছে? তবে যাই ঘটুক, আজ লোকজনের সামনে এই যে তাকে অপমান করা হলো, এটা সে মেনে নেবে না।

পামেলা সিদ্ধান্ত নিল, সে তার বোনের কাছে নিউ ইয়র্কে চলে যাবে। ফাউলারকে ভালবেসেই বিয়ে করেছিল সে, কিন্তু সেই ভালবাসার কিছুই আর অবশিষ্ট নেই, কাজেই তার সঙ্গে ঘর করার আর কোন মানে হয় না। সে বরং আবার মডেলিং শুরু করবে।

কমপ্লেক্স থেকে বেরিয়ে আসার পর রানাকে ফাঁকি দিয়ে ভিড়ের সঙ্গে মিশে গেল লীনা ওয়াং, রাস্তা পেরিয়ে দুশো গজ হাঁটল, উঠে এল একটা পার্কিং গ্যারেজের তিনতলায়। লাল একটা ফেরারির দরজা খুলল সে, সীটে বসে বোতামে চাপ দিতে একটা প্যানেল সরে গেল, ভেতরে দেখা গেল একটা কমপিউটর মনিটর ও ফ্যাক্স মেশিন। কী বোর্ডের বোতামে দ্রুত চাপ দিয়ে নামটা টাইপ করল সে- মাসুদ রানা। সাবজেক্টের জাতীয়তা- ইউনাইটেড কিংডম। চেহারার বৈশিষ্ট্য- সুদর্শন। টাইপ করার সময় আপন মনে হাসছে লীনা।

স্ক্রীনে ফুটে উঠল একটা মাত্র শব্দ- সার্চিং।

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করতে হবে, সময়টা নষ্ট না করে কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট করার জন্যে ফ্যাক্স মেশিন চালু করল লীনা।

লীনা ওয়াং চায়না ইন্টেলিজেন্স-এর একজন এজেন্ট। বিশেষ একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে বেইজিং থেকে হামবুর্গে পাঠানো হয়েছে তাকে। ব্যাপারটা শুরু হয় জেনারেল ফুয়াং চু দেশ ছেড়ে

পালানোর পর। জেনারেল শুধু যে পালিয়ে গেছেন, তা নয়, সঙ্গে করে অতি গোপন ও মূল্যবান একটা ডিভাইসও নিয়ে গেছেন।

বস্ তাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন ডিভাইসটা কি। ওটা একটা রেডার, এতটাই লো-ফ্রিকোয়েন্সী ওয়েভ প্রডিউস করে যে কোন প্লেনে ব্যবহার করা হলে সেটা অন্য কোন রেডারে ধরা পড়বে না। চীন-সোভিয়েত সীমান্তে একটা সোভিয়েত প্লেন দুর্ঘটনায় পড়ে বিধ্বস্ত হয়, রাশিয়ানদের আগে চীনা সৈন্যরা পৌঁছায় সেখানে, তারাই ডিভাইসটা দেখতে পেয়ে নিজেদের ঘাঁটিতে নিয়ে আসে। বেইজিঙে আনার পর জেনারেল ফুয়াং চুকে ওটা নিরাপদে রাখতে দেয়া হয়েছিল।

বস্ লীনাকে ডিভাইসটার গুরুত্ব ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। পরীক্ষা করার পর ওটার টেকনোলজি সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যাবে, তারপর তাঁরা নিজেরাই ওরকম রেডার তৈরি করতে পারবেন। ফলে তাঁদের সামরিক ক্ষমতা অনেক বেড়ে যাবে, কারণ তখন তাঁদেরও অনেক ভেহিকেল শত্রুপক্ষের রেডারে ধরা পড়বে না।

লীনাকে জানানো হয়, সন্দেহ করা হচ্ছে জেনারেল ফুয়াং চু ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় আত্মগোপন করে আছেন। তবে না, ডিভাইসটা তিনি সঙ্গে করে নিয়ে যাননি, অন্য কোনভাবে দেশের বাইরে পাচার করেছেন।

খোঁজ নিতে গিয়ে লীনা জানতে পারে রেডারটা রফতানিযোগ্য চা-এর বাক্সে ভরা হয়েছিল, বাক্সটা তোলা হয়েছিল জার্মানগামী একটা জাহাজে। তদন্তে ধরা পড়ল, হামবুর্গের ফাউলার মিডিয়া গ্রুপ নেটওঅর্ক বিল্ডিং থেকে চা-এর একটা অর্ডার এসেছিল,

বাক্সটা সেখানেই ডেলিভারি দেয়া হয়েছে। এই সূত্র ধরেই লীনার হামবুর্গে আগমন।

লীনা এখন জানে, গোলযোগ থেমে গেলে এফএমজিএন বিল্ডিঙে চুপিচুপি তাকে একবার ঢুকতে হবে। তার ধারণা, লো-ইমিশন রেডার ডিভাইসটা ওই বিল্ডিঙেই কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে। ফাউলার আর তাঁর প্রতিষ্ঠানের যতটুকু দেখেছে সে, পুরোটাই অশুভ আর ভুয়া মনে হয়েছে তার। বসকে রিপোর্ট করার সময় কথাটা জানাতে ভুলল না।

ইতিমধ্যে কমপিউটর তার সার্চ শেষ করেছে। ভুরু কুঁচকে স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে থাকল লীনা। মাসুদ রানা সম্পর্কে কোন তথ্যই কমপিউটর দিতে পারছে না। লীনা ভাবল, সে যদি ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট হয়, তার কাভারও দুর্ভেদ্য হবার কথা। কমপিউটরকে আরও তথ্য দিতে না পারলে কাজ হবে না। ঠিক আছে, পরে চেষ্টা করা যাবে।

হামবুর্গের আটলান্টিক হোটেলে উঠেছে রানা। এখানকার একজন বাঙালী শেফ, সিলেটের লোক, ওর খুব ভক্ত। তবে এই মুহূর্তে খিদে বা খাদ্যবস্তু নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রশ্নই ওঠে না, পেটের লাল হয়ে ফুলে ওঠা মাংস আর চামড়ার ওপর বরফ চেপে ধরে ব্যথায় কাতরাচ্ছে। এমনি সময় নক হলো স্যুইটের দরজায়।

বাথরূম থেকে বেরিয়ে এল রানা, একটা তোয়ালে কোমরে জড়ানো, আরেকটা তোয়ালে পেটের ওপর চেপে ধরা- দ্বিতীয়টার ভেতর বরফের টুকরো আছে। দ্বিতীয় তোয়ালে ফেলে দিয়ে বালিশের তলা থেকে পিস্তলটা হাতে নিল ও, সুইচের দিকে হাত

বাড়িয়ে নিভিয়ে দিল আলো। সিটিংরূমে ঢুকে দরজার পাশে দাঁড়াল, কোন আওয়াজ করছে না। আবার নক হতে বলল, 'কাম ইন।'

অন্ধকার স্যুইটের ভেতর ঢুকল কেউ। দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে তার ঘাড়ে পিস্তলটা চেপে ধরল রানা।

পামেলার গলা শোনা গেল, 'রূম সার্ভিসকে এভাবেই খাতির করো বুঝি?'

আলো জ্বালল রানা। রূম সার্ভিসের একটা ট্রলি নিয়ে এসেছে পামেলা, তাতে শ্যাম্পেনের বোতল আর গ্লাস রয়েছে। এখনও পার্টির সেই ড্রেসই পরে রয়েছে পামেলা। পিস্তল পকেটে ভরে দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা। এতক্ষণে ওর পেটের দিকে নজর পড়ল পামেলার, আঁতকে উঠল সে। 'ওহ্ গড!'

চড় খাওয়া গালে হাত তুলল রানা। 'এখানে ব্যথাটা আরও বেশি। কিন্তু মারলে কেন? খারাপ কিছু বলেছিলাম, এত বছর পর তার প্রতিশোধ নিলে?'

'বললে, অপেক্ষা করো, এখুনি ফিরে আসছি- কিন্তু পাঁচ বছর আর এলে না।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'হঠাৎ ঘাড়ে একটা কাজ চাপে।'

'তোমার সব ভাল, শুধু মাঝে মধ্যে দু'একটা মিথ্যে অজুহাত বাদে।'

'তোমারও সব ভাল, শুধু ম্যাগাজিনে ছবি ছাপাবার লোভটা বাদে।'

'সেই শখ আজ আর নেই আমার,' বলল পামেলা। 'আমি বদলে গেছি, রানা।'

দরজায় তালা লাগাল রানা। 'তুমি সুখী হয়েছ জানতে পারলে আমি খুশি হব।'

কাউচে বসল পামেলা। 'বিয়ের আগেই ওকে আমি ভালবাসি। সদর্থে অ্যামবিশাস ছিল ও, অত্যন্ত শক্ত ধাতুতে গড়া একজন কাজ পাগল মানুষ। কিন্তু মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে বদলে গেল, হয়ে উঠল একটা মনস্টার। আমি ওকে ফেরাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম। তুমি কি এতটাই অসুস্থ যে শ্যাম্পেনের বোতল খুলতে পারবে না?'

'তুমি জানো এ-সব আমি খাই না।'

'তারমানে তুমি বদলাওনি।'

'না।' ইতস্তত করছে রানা। 'কেন এসেছ, পামেলা?'

'ওকে আমি ছেড়ে এসেছি,' বলল পামেলা। 'প্রায়ই মার খাচ্ছি, তবে লোকজনের সামনে নয়। আজ...'

'ফাউলারকে ত্যাগ করা অত্যন্ত বিপজ্জনক হতে পারে।'

'জানি। তবে আমি শুধু পরনের কাপড় আর পুরানো পাসপোর্টটা নিয়ে এসেছি। নিউ ইয়র্কে আমার এক বোন আছে, সে-ই নিজের টাকা দিয়ে প্লেনের টিকেট কেটে এয়ারপোর্টে পাঠিয়ে দিচ্ছে। কাল বিকেলের ফ্লাইটে চলে যাচ্ছি আমি। ততক্ষণ তোমার এখানে যদি লুকিয়ে থাকতে চাই...'

'ঝুঁকি আছে, তবে তোমাকে আমি ফিরিয়ে দিতে পারি না,' বলল রানা। 'তোমার পিছু নিয়ে কেউ আসেনি তো?'

'না, আমি খুব সাবধানে এসেছি।' কি যেন চিন্তা করল পামেলা। 'কথা দিচ্ছি, আমি তোমাকে কোনভাবে বিব্রত করব না। এমনকি, পুরানো সম্পর্কের কথাটাও মনে করিয়ে দেব না।'

'হ্যাঁ, অতীত ভুলে থাকাই ভাল।'

'এখন তাহলে তুমি ব্যাংকার?' হেসে উঠল পামেলা। 'বলো দেখি, এখনও কি বালিশের তলায় পিস্তল রেখে ঘুমাও?'

'অভ্যাস।'

বোতলটা খুলে একটা গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢালল পামেলা, চুমুক দিয়ে বলল, 'আমাকে বলবে, এখানে তুমি কি করছ? ফাউলারই বা কি করছে? তুমি একটা ক্রাইমের কথা বলেছ। আসলে কি ঘটছে বলো তো?'

'তোমার স্বামী হয়তো বিপদের মধ্যে আছে।'

'স্যাটেলাইট সম্রাটের বিপদ? না, রানা, তুমি যদি ওর পিছনে লেগে থাকো, বুঝতে হবে তুমিই বিপদের মধ্যে আছ।'

'আমার কাজই বিপদের মধ্যে থাকা,' বলল রানা। 'তবে, কি জানো, ক্রাইমটা ফাউলার করছে, নাকি তার অর্গানাইজেশনের অন্য কেউ, আমি সঠিকভাবে জানি না।'

'তারমানে কি তুমি আমার কাছ থেকে তথ্য চাও?'

'না। আমার প্ল্যানে তুমি নেই।'

পামেলা জানে, রানা মিথ্যে কথা বলছে। 'শোনো, মি. ব্যাংকার...,' ঝুঁকে রানার কপালে হালকা একটা চুমো খেলো সে, '...ভাল না বাসলেও, সে আমার স্বামী, আমি তার সঙ্গে বেঈমানী করতে পারব না।'

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দূরে সরে এল রানা। 'ঠিক আছে, বুঝতে পারছি। তুমি বেডরূমে থাকো, আমি সিটিংরূমে, কেমন? কাল আমি তোমাকে এয়ারপোর্টে দিয়ে আসব।'

'রাতটা আমরা গল্প করে কাটাতে পারি না?' জিজ্ঞেস করল

পামেলা, ম্লান হয়ে গেল চেহারা। 'অন্তত যে কথাটা বলি বলি করেও বলা হয়নি, সেই কথাটা আজ আমাকে বলার সুযোগ দেবে না?'

'কি কথা?' অবাক হয়ে জানতে চাইল রানা।

'তুমি ছিলে আমার জীবনের একমাত্র পুরুষ যে জানত একটা মেয়েকে কিভাবে ছুঁতে হয়, কিভাবে ভালবাসতে হয়, কিভাবে তার যত্ন নিতে হয়। তুমি ছিলে আমার জীবনে একমাত্র সত্যিকার পুরুষ।'

'কিন্তু পামেলা, সে-সব কথা মনে রেখে কেন শুধু শুধু নিজেকে...'

'না, রানা, নিজেকে আমি কষ্ট দিতে চাইছি না,' মাথা নেড়ে বলল পামেলা। 'আমি শুধু তোমার আমার সম্পর্কটা রোমন্থন করতে চাইছি। তাতে যদি একটা রাত সুখী হতে পারি আমি, তুমি নিষ্ঠুরের মত বাধা দিতে চাইছ কেন?'

হেসে ফেলল রানা। 'তুমি আগের মতই রোমান্টিক আর ছেলেমানুষ রয়ে গেছ, পামেলা।'

'হ্যাঁ, সেদিক থেকে আমি বদলাইনি,' স্বীকার করল পামেলা। 'বোধহয় সেজন্যেই আমার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিলে তুমি, তাই না?'

এফএমজিএন কমপ্লেক্সের পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ শান্ত। ফায়ার ডিপার্টমেন্ট চেক করার পর রিপোর্ট দিয়েছে কোথাও আগুন লাগেনি, ব্যাপারটা ফলস অ্যালার্মই ছিল। অতিথিরা সবাই চলে গেছেন। বেশিরভাগ খাবার আর শ্যাম্পেনে হাতই দেয়া হয়নি।

কমপ্লেক্সের ভেতর প্রতিটি ইঞ্চি সাদা পাউডারে ঢাকা। ওপরের অন্ধকার নিউজরূমে, সামনে কনসোল নিয়ে গম্ভীর মুখে বসে আছে ম্যাডক ফাউলার। পার্টি চলার সময় অতিথিদের দিকে তাক করা একটা ক্যামেরার টেপ মনিটরে দেখানো হচ্ছে এখন। পামেলা আর রানাকে দেখতে পেয়ে বোতামে চাপ দিল ফাউলার, ছবিটা ফ্রিজ হয়ে গেল স্ক্রীনে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, তার স্ত্রী পামেলা রানার কানে ফিসফিস করছিল। ব্যাপারটা কি? গোপন কোন সম্পর্ক?

ফাউলার হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠল। দাঁতে দাঁত ঘষছে। রাগের সঙ্গে দেরাজ খুলে একটা শিশি বের করল, পানি ছাড়াই একজোড়া ট্যাবলেট খেলো। কামরার আরেক প্রান্তে ফোনে কথা বলছে মেনাচিম। কথা শেষ হতে ফাউলারের কাছে চলে এল সে। বলল, 'খারাপ খবর, স্যার।'

'বলো।'

'মাসুদ রানা বাংলাদেশী, কিন্তু সঙ্গে ব্রিটিশ পাসপোর্টও রাখে। শোনা যাচ্ছে ব্রিটিশ ফরেন অফিসের সঙ্গে কি রকম একটা সম্পর্ক আছে।'

স্পরিষ্কার কথা, স্পাই। আর কি?'

'শুনতে আপনার ভাল লাগবে না, স্যার।'

'আমার স্ত্রী চলে গেছেন।'

মেনাচিম অবাক। বস্ তাহলে জানেন? তবে, এ-ও ঠিক, বস্ সব সময় তার চেয়ে এক পা এগিয়ে থাকেন। আরে, সেজন্যেই তো উনি বস্।

স্পামেলা আমাকে মিথ্যে কথা বলছে। আমার সঙ্গে বেঈমানী

করেছে। ও দায়ী,' আঙুল তুলে মনিটরের রানাকে দেখাল ফাউলার। 'আমাদের লোকজনকে বেরিয়ে পড়তে বলো, শহরের ভবঘুরে আর হোটেল ক্লার্কদের ঘুষ দিক- যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই মাসুদ রানাকে আমার সামনে হাজির করো। আমি যদি ওর পিঠের ছাল না তুলি! আর পামেলাকে...'

'চিন্তা করবেন না, স্যার। তাঁকেও আমরা খুঁজে বার করব।'

'আমরা প্রথমে রানাকে ধরব। তাকে পেলে পামেলাকেও পাব।'

'স্যার, পাবার পর কি আমাকে...'

'না।' কঠিন হয়ে উঠল ফাউলারের চেহারা। 'ভুলে যেয়ো না ও আমার স্ত্রী।' এক মুহূর্ত চিন্তা করল। 'যাও, ডাক্তারকে খবর দাও।'

পাঁচ

পামেলার ঘুম ভাঙল খুব ভোরে। চোখ মেলার পর বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেলো সে, ঝট করে বিছানায় উঠে বসল। কাল কি কাণ্ড করেছে মনে পড়ে গেল সব। স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে এসেছে সে, আশ্রয় নিয়েছে বহুকাল পর দেখা অন্য এক পুরুষের হোটেল স্যুইটে। তারপর পামেলা ভাবল, এ এমন এক পুরুষ, যার সঙ্গে এক ছাদের নিচে থাকা যায়, ভয় পেতে হয় না। কাল রাতে রানার বেডরুমে ঢুকে দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়েছিল ও, তালা দেয়নি। শোবার আগে কাপড়চোপড় ছেড়ে চাদরের তলায় ঢোকার সময়ও কোন ভয় বা দ্বিধা ছিল না মনে, জানত সে না ডাকলে ভুলেও বেডরুমে ঢুকবে না রানা। এতটা বিশ্বাস করা যায় এমন পুরুষ দুনিয়াতে খুব বেশি নেই।

সাত বছর আগে নিউ ইয়র্কে ওদের দেখা হয়েছিল। তখন সে ছিল মিস পামেলা ক্যাম্পবেল, ফ্যাশন জগতের নতুন স্টার। ওর বাবা ধনী স্টকব্রোকার ছিলেন, লেখাপড়া শেষ করে মেয়ে মডেলিং শুরু করায় তিনি কোন আপত্তি তোলেননি। রানার সঙ্গে ওর

পরিচয় হয় একটা মডেল ওয়াচ অনুষ্ঠানে। রানার সঙ্গে অন্য একটা মেয়ে ছিল, সেটাকেই এক ধরনের সতর্ক-সঙ্কেত হিসেবে গণ্য করা উচিত ছিল পামেলার। কিন্তু না, শুধু চোখের দেখায় মাথা ঘুরে যায় ওর। তারপর যেচে পড়ে কথা বলল, আর সেই সঙ্গে মজে গেল। তখন কিন্তু ব্যাপারটাকে একতরফা বলেও মনে হয়নি। রানাও পামেলার রূপ-সৌন্দর্য আর ভাবাবেগ লক্ষ করে মুগ্ধ হয়ে পড়ে, আরও বেশি প্রভাবিত হয় মেয়েটা নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে দেখে। বিদায় নেয়ার সময় আবার দেখা হবে কিনা সে আভাস কেউ কাউকে দেয়নি, তবে রানা পরদিনই ওকে ফোন করে। এরপর দুটো মাস রোজ তারা এক হয়েছে, এখানে-সেখানে বেড়িয়েছে, দামী রেস্তোরাঁয় খেয়েছে, পরস্পরকে এটা-সেটা প্রেজেন্ট করেছে। রোমান্স যখন তুঙ্গে, পামেলা বিশ্বাস করতে শুরু করে যে ওদের বিয়ে হবে। রানাকে পাগলের মত ভালবাসে ও, রানাকে ছাড়া বাঁচবে না, এ-সব অনুভূতির কথা বান্ধবীদের বলতে শুরু করল। ব্যাপারটা টের পেয়ে যায় রানা, সাবধানও করে দেয়, কিন্তু এ-সব রানার রসিকতা ভেবে কোন গুরুত্বই দেয়নি। তারপর একদিন কোন ব্যাখ্যা না দিয়েই গায়েব হয়ে যায় রানা। একেবারে কোন কারণ ছাড়াই, তা হয়তো নয়। কোন ফ্যাশন ম্যাগাজিনে পামেলার সঙ্গে রানার ছবি ছাপা যাবে না, এ-কথা বার বার মনে করিয়ে দেয়া সত্ত্বেও খেয়াল বশত একটা ম্যাগাজিনে নিজেদের একটা ছবি পাঠিয়ে দেয় পামেলা। পরদিনই ওর জীবন থেকে হারিয়ে গেল রানা। পামেলা ভেবেছিল রানাকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারবে না, কিন্তু কাল আবার দেখা হতে উপলব্ধি করে, তা সত্যি নয়।

রানা অদৃশ্য হবার কয়েক বছর পর ম্যাডকের সঙ্গে পরিচয় হয় পামেলার। সেটা ছিল এক ককটেল পার্টি। তখনই একজন সেলিব্রিটি হয়ে উঠেছে ম্যাডক, পৃথিবী নামক গ্রহের অন্যতম এক ধনী ব্যক্তি, বয়েস একটু বেশি হলেও দেখতে অত্যন্ত সুদর্শন ও সুপুরুষ। প্রথমে ব্যাপারটা ছিল এক তরফা ভালবাসা, পরে পামেলাও তাকে ভালবাসে। তিন মাস পর তাদের বিয়ে হয়। বিয়ের পর মডেলিং ছেড়ে দেয় পামেলা।

বিছানা থেকে নেমে কাপড় পরল পামেলা, তারপর দরজা খুলে সিটিংরূমে ঢুকল। শোল্ডার হোলস্টার পরেছে রানা, পিস্তলটা হাতে নিয়ে মেকানিজম চেক করছে। এক্সট্রা ক্লিপগুলো জ্যাকেটের পকেটে ঢুকিয়ে রাখল। 'খুব কম ব্যাংকারই সঙ্গে অস্ত্র রাখে, তাই না?' রানার পিছনে এসে দাঁড়াল পামেলা।

'ব্যাংকিংও আজকাল বিপজ্জনক পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে,' বলল রানা, ঘুরে দাঁড়িয়ে মুচকি হাসল।

'আচ্ছা, বলতে পারো, শুধু তোমার মত পুরুষরা কেন আমাকে আকৃষ্ট করে? নিন্দা করছি না, তবে কথাটা সত্যি– তুমি অনেকটাই আমার স্বামীর মত– নির্লিপ্ত, ঠাণ্ডা, খানিকটা নিষ্ঠুর, সব সময় মনে হয় অনেক দূরে আছ, কেমন যেন রহস্যময়।'

'হ্যাঁ, কথাটা সত্যি।'

'এত সকাল সকাল কোথায় যাচ্ছ বলো তো?'

'তোমার স্বামীর কমপ্লেক্সটা ঘুরেফিরে দেখতে হবে। খবরের কাগজের অফিসে সকালের দিকে সবাই খুব ব্যস্ত থাকে, এটাই আদর্শ সময়।'

'ওখানকার সিকিউরিটি সম্পর্কে তোমার কোন ধারণা আছে?

তোমাকে ওরা খুঁজছে, রানা।'

'তবু, কাজটা না করলেও নয়।'

'তুমি আমার মনে অপরাধবোধ জাগাতে চেষ্টা করছ,' অভিযোগ করল পামেলা। 'আমাকে দিয়ে এমন কিছু বলাতে চাইছ যা বললে তোমার খুন হবার আশঙ্কা বাড়বে।'

'এ তোমার ভুল ধারণা। তবে যেতে আমাকে হবেই।'

'নিউজরুমের ঠিক বাইরে লবিটার কথা মনে আছে? বড় একটা স্যাটেলাইট আছে যেখানে?'

'আছে।'

'ওটার পিছনে অফিস ছিল, কিন্তু পাঁচিল তুলে দিয়েছে ওরা। কোন ধরনের ল্যাব বা অন্য কিছু আছে ওখানে। মানে সন্দেহ করছি আর কি। তবে কিভাবে ওরা ভেতরে ঢোকে জানি না। দুই বিল্ডিঙের মাঝখানে প্ল্যান্ট মেইনটেন্যান্স লেভেল আছে, যতদূর মনে পড়ছে অফিসটা ছিল সরাসরি তার নিচে। অফিস আর ওই লেভেলের মাঝখানে সিঁড়ি থাকার কথা।'

'ধন্যবাদ, পামেলা।'

এগিয়ে এসে রানার কপালে হালকা চুমো খেলো পামেলা। তারপর দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলল, 'তোমাকে আমি দেবতা হিসেবে পেয়েছি, কিন্তু চেয়েছিলাম প্রেমিক হিসেবে- দুঃখটা রয়েই গেল।'

রানা কথা বলছে না।

'চেষ্টা করলেও আমি বোধহয় তোমার যাওয়াটা বন্ধ করতে পারি না, না?'

রানা জবাব দিল, 'চিন্তা কোরো না। কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে

আসব।' ঘুরে দরজার দিকে এগোল ও।

রানা চলে যাবার পর দরজা বন্ধ করে দিল পামেলা, বিড়বিড় করে আপন মনে বলল, 'সাত বছর আগেও এই একই কথা বলেছিলে তুমি।'

এফএমজিএন কমপ্লেক্সে সিকিউরিটি আজ খুব কড়া। নতুন হেডকোয়ার্টারে জয়েন করেছে কর্মচারীরা, খবর সংগ্রহ ও সাজানোর কাজে ব্যস্ত সবাই, প্রেস সেকশনে প্রথম সংস্করণ ছাপার কাজও শুরু হয়ে গেছে পুরোদমে। এখনও প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন খবর আসছে স্যাটেলাইট থেকে, সবগুলো মনিটর জ্যান্ত। অন্যান্য দিনের সঙ্গে পার্থক্য শুধু এইটুকু যে আজ চারদিকে সিকিউরিটি গার্ড গিজগিজ করছে। কর্মচারীদের মধ্যে একটা কথা ছড়িয়ে পড়েছে, কাল সন্ধ্যার ফলস অ্যালার্ম ছিল ম্যাডক ফাউলারের বিরুদ্ধে এক ধরনের স্যাবোটাজ।

বিল্ডিংগুলোর প্রতিটি তলায় টহল দিচ্ছে গার্ডরা, তবে কেউ তারা একবারও ভাবেনি যে ছাদ থেকে অনধিকার প্রবেশের ঘটনা ঘটতে পারে। প্রিন্টিং রূম থেকে বেরিয়ে দুই বিল্ডিঙের মাঝখানের সেতুতে দাঁড়াল দু'জন গার্ড, জানে না তাদের মাথার ওপর স্কাইলাইটের পাশে একটা ছায়ামূর্তি লুকিয়ে আছে। একজন গার্ড সিগারেট ধরাবার জন্যে থামল, খেয়াল করল না, ছাদের গম্বুজ আকৃতির চূড়া থেকে নিঃশব্দে সরে গেল মাসুদ রানা।

ছাদে উঠতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি রানাকে। তিন-চারটে বিল্ডিং নিয়ে কমপ্লেক্সটা, তার মধ্যে দুটো বিল্ডিং এখনও নির্মাণাধীন। সকাল সকাল পৌঁছেছে রানা, শ্রমিকদের জন্যে

নির্ধারিত লিফটে চড়ার সময় কেউ ওকে দেখতে পায়নি। লিফটে ওঠার আগে লোহার একটা হ্যাট তুলে নিয়ে মাথায় পরতে ভোলেনি, কেউ দেখলে যাতে ফোরম্যান বলে মনে করে। লিফট ওকে একটা বিল্ডিঙের টপ ফ্লোরে পৌঁছে দেয়, সেখান থেকে একটা ঝুল-বারান্দায় চলে আসে ও, তারপর মই বেয়ে উঠে পড়ে পাশের বিল্ডিঙের ছাদে। আরেকটা মই বেয়ে স্কাইলাইট থেকে ছাদের নিচে প্ল্যান্ট ও মেইনটেন্যান্স এরিয়ায় চলে এল, পাশ কাটাল একটা ঢাকা হ্যাচকে। হ্যাচের কন্ট্রোল তালা দেয়া আলাদা একটা ঢাকনির ভেতর। পকেট থেকে সেল ফোন বের করল রানা, অ্যান্টেনাটা লম্বা করল টেনে। অ্যান্টেনার ডগায় যে ডিভাইসটা আছে সেটাকে লকপিক হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। ঢাকনি খুলে হ্যাচের কন্ট্রোল উন্মুক্ত করতে মাত্র সাত সেকেন্ড সময় লাগল। সবুজ একটা বোতামে চাপ দিতেই ঝাঁকি খেয়ে খুলে গেল হ্যাচ। এক প্রস্থ সিঁড়ি দেখা গেল, নিচের দিকে নেমে গেছে। পামেলার স্মৃতিশক্তি খুবই ভাল।

সিঁড়ি বেয়ে একটা ল্যাবরেটরিতে নেমে এল রানা। ভেতরে ড্রাফটিং ও কমপিউটর টেবিল রয়েছে। সবগুলো খালি। কামরার মাঝখানে ফাউলারের ডুপ্লিকেট স্যাটেলাইট দেখা গেল। আরেক দরজা দিয়ে পাশের অফিসে যাওয়া যায়।

চারদিকে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে স্যাটেলাইটটার দিকে মনোযোগ দিল রানা। এটা নিশ্চয়ই টেস্ট মডেল, পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে ব্যবহার করা হয়। সার্কিট প্যানেল দেখতে যাবে, পায়ের আওয়াজ শুনতে পেয়ে স্যাটেলাইটের পিছনে লুকিয়ে পড়তে হলো। প্রাইভেট অফিসের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল

কেউ।

খায়রুল কবির, সঙ্গে তিনজন বডিগার্ড। এই তিনজনকেও আফগানিস্তানে দেখেছে রানা, কবিরের সঙ্গে ছিল। স্যাটেলাইটের সোলার প্যানেলের ফাঁক দিয়ে ওদেরকে দেখতে পাচ্ছে ও। 'এটার কাজ শেষ হয়েছে, কাজেই লঞ্চ সাইটে পাঠিয়ে দিতে হবে,' লোকগুলোকে বলল কবির। 'ব্যাপারটা বুঝি না, অফিসে কোন খাবার নেই কেন? আমি নাস্তা খেতে চললাম।' ল্যাবরেটরির পিছন দিকে ভারী একটা ইস্পাতের দরজা রয়েছে, সেটা খুলে ভেতরে ঢুকল সে, পিছু নিল বাকি তিনজন।

স্যাটেলাইটের পিছন থেকে বেরিয়ে প্রাইভেট অফিসের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল রানা। দরজাটা সুরক্ষিত করা হয়েছে একটা ইলেকট্রনিক কার্ড লক-এর সাহায্যে। সেল ফোনটা আবার বের করল, লকের ইলেকট্রিক আর্ক-এ স্টান গান টার্মিনাল ঠেকিয়ে চাপ দিল বোতামে। জোরাল একটা আওয়াজ হলো, লকের ইন্ডিকেটর মুহূর্তের জন্যে সবুজ আলো ছড়াল, শেষ হয়ে গেল পুড়ে। কবাটে কাঁধ ঠেকিয়ে ঠেলা দিতে খুলে গেল দরজা।

কবিরের প্রাইভেট অফিস খালি বললেই হয়। তবে রিফিউজ বিন ভর্তি হয়ে আছে সফট ড্রিঙ্কের ক্যান আর পটেটো চিপস-এর খালি ব্যাগে। ডেস্কের ওপর একটা কমপিউটর দেখা গেল, দেয়াল ঘেঁষে কয়েকটা ফাইলিং কেবিনেটও রয়েছে। একটা দেরাজ খুলে ভেতরে ডিস্ক আর প্রোগ্রাম দেখল রানা। আরেকটা দেরাজে পাওয়া গেল কয়েক ডজন স্যাটেলাইট রেফারেন্স ম্যাটেরিয়াল, মোটা টেকনিকাল বই-পত্র; বইগুলো গ্লোবাল পজিশনিং, রেডার ও কমপজিট রেজিন টেকনলজি সম্পর্কিত। নাহ্, ওকে আগ্রহী করার

মত কিছু নেই।

তারপর দেয়ালে লটকানো একটা ছবির ওপর চোখ পড়ল। ফ্রেমটা ইস্পাতের, আকারে খুব বড়- ফাউলারের একটা স্যাটেলাইটের ছবি, মহাশূন্যে রয়েছে। রানার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অদ্ভুত একটা খুঁত ধরা পড়ল। ফ্রেমের একটা পাশ অন্য পাশের চেয়ে সামান্য একটু বেশি পুরু। কিনারায় আঙুল বোলাল ও, লুকানো ক্যাচটা স্পর্শ করল। টান দিতেই খুলে গেল ফ্রেমটা।

ফ্রেমের পিছনে একটা ওয়াল সেফ রয়েছে, থাম প্রিন্ট স্ক্যানার-এর সাহায্যে লক করা। রানা ধারণা করল, কবিরের ফিঙ্গার প্রিন্ট ছাড়া লকটা খোলা যাবে না।

সেল ফোনের সামনের অংশে লেযার আছে, সেটা অ্যাকটিভেট করল রানা। সেফের গায়ে একটা জানালা আছে, সেফ খোলার সময় ওখানে আঙুল ছোঁয়ানো হয়। জানালা স্ক্যান করার জন্যে লেযার ব্যবহার করল ও। দুই সেকেন্ড পরই কবিরের আঙুলের ছাপ ফুটে উঠল সেল ফোনের ডাটা স্ক্রীনে। ফোনটা এবার উল্টো করে থাম প্রিন্ট উইন্ডোয় ঠেকাল রানা, সঙ্গে সঙ্গে ক্লিক শব্দে খুলে গেল সেফ। ফোনটা পকেটে রেখে দিয়ে সেফের ভেতরে তাকাল ও।

আফগানিস্তান থেকে কেনা কবিরের লাল বাক্সটা দেখতে পেয়ে বের করে আনল রানা। কাজ হয়েছে! লাল বাক্সের ভেতর হারানো অ্যাকসেস ডিভাইসটা রয়েছে। তাড়াতাড়ি বাক্সটা বন্ধ করল, ভরে ফেলল পকেটে। সেফ বন্ধ করে বেরিয়ে এল প্রাইভেট অফিস থেকে।

ইস্পাতের ভারী দরজার দিকে এগোল রানা। এই পথে

কমপ্লেক্সের বাকি অংশে যাওয়া যায়। দরজার কবাটে কান ঠেকিয়ে অপেক্ষা করল। কোন শব্দ হচ্ছে না। সাবধানে খুলল সেটা।

পা থেকে মাথা পর্যন্ত কালো ড্রেস পরা লীনা ওয়াং ঠিক বাইরেই দাঁড়িয়ে। বাইরে থেকে দরজার তালায় কিছু একটা ঢুকিয়েছিল সে, অর্থাৎ দরজা খুলে ভেতরে ঢোকার ইচ্ছে ছিল। হঠাৎ অ্যালার্ম বেজে উঠল। অমনি চারদিক থেকে হৈ-চৈ শুরু করল টহলরত গার্ডরা।

'সর্বনাশ করেছেন!' আঁতকে উঠল রানা। 'এখন কি হবে?'

'আমার কথা ভাববেন না, নিজের জান বাঁচান!' লাফ দিয়ে পিছু হটল লীনা, ডুব দিল সিঁড়ির নিচে। এরইমধ্যে করিডরে বেরিয়ে এসেছে গার্ডরা।

ইস্পাতের দরজা বন্ধ করল রানা, জায়গা মত বসিয়ে দিল বোল্টটা। ধাতব আওয়াজ তখনও বাতাসে মিলিয়ে যায়নি, এক ঝাঁক বুলেট এসে লাগল কবাটে, রানার কানে তালা লেগে গেল।

ধোয়ার পর মাথার সব চুল তোয়ালেতে জড়াল পামেলা, তারপর হোটেল থেকে পাওয়া ঢোলা ও নরম একটা রোব পরল। স্বামীর সামনে রানাকে চড় মেরেছে, সেজন্যে এখন অনুতপ্ত ও। ওর এই আচরণ স্বামীকে উত্তেজিত ও সন্দেহপ্রবণ করে তোলার জন্যে যথেষ্ট ছিল। সে যাই হোক, ওই লোকের ঘর করা তার পক্ষে আর সম্ভব নয়। রানা ফিরে আসুক, ওর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবে সে। তারপর বোনের কাছে নিউ ইয়র্কে চলে যাবে।

সিটিংরূমে ঢুকে একটা ম্যাগাজিন নিয়ে সোফায় বসল পামেলা। এক মিনিট পরই মৃদু নক হলো দরজায়। হাসল ও।

সোফা ছেড়ে দরজা খোলার সময় বলল, ‘এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে…’

হৃৎপিণ্ড যেন গলায় উঠে এল। পাশে মেনাচিমকে নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে ম্যাডক ফাউলার। ওদের মুখের ওপর কবাট বন্ধ করতে চাইল পামেলা, কিন্তু পারল না, ভেতরে একটা পা গলিয়ে দিয়েছে মেনাচিম। কবাট পুরোপুরি খুলে ভেতরে ঢুকল সে, তার পিছু নিয়ে ফাউলার। ফাউলারই ধাক্কা দিয়ে স্ত্রীকে মেঝেতে ফেলে দিল। ঘুরে দরজাটা বন্ধ করে দিল মেনাচিম। এগিয়ে এল ফাউলার, পামেলার গলাটা এক হাতে ধরে দাঁড় করাল। পামেলার পিছনে চলে এল মেনাচিম, ওর হাত দুটো পিছমোড়া করে ধরে রাখল। স্ত্রীর গলা ছেড়ে দিয়ে কষে দুটো চড় মারল ফাউলার।

‘ম্যাডক, প্লীজ!’ আতঙ্কে নীল হয়ে গেছে পামেলা। ‘তুমি বুঝতে পারছ না…তুমি যা ভাবছ তা নয়…’

‘নয়? তাহলে বলো আসল ব্যাপারটা কি?’

‘কাল রাতে তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছ। যাবার আর কোন জায়গা নেই বলে এখানে আমি পালিয়ে এসেছি…’

‘কাল রাতে কি বলেছিলাম তোমাকে? কোন্ জিনিসকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিই আমি?’

বহুকষ্টে একটা ঢোক গিলল পামেলা।

‘আনুগত্য, ডার্লিং,’ তিক্ত হেসে বলল ফাউলার। ‘আনুগত্য।’

সিঁড়ির দিকে ছুটছে রানা, ওর পিছনে ইস্পাতের দরজা ভেঙে পড়ল। গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে কামরার ভেতর ঢুকে পড়ল গার্ডরা। পা দিয়ে স্যাটেলাইটটা সরিয়ে ওদের পথে একটা বাধা তৈরি করল

রানা, সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ছাদে, ঢাকনিটা টেনে এনে হ্যাচের মুখ বন্ধ করে দিল। ছাদ ধরে ছুটছে ও, যাচ্ছে মইটার দিকে। তারপর দেখল, মইয়ের অপরপ্রান্তে ওর জন্যে একজন গার্ড অপেক্ষা করছে। গুলি করল লোকটা, বাধ্য হয়ে পিছিয়ে আসতে হলো ওকে, পিঠ ঠেকল ইমার্জেন্সি ফায়ার ডোরের গায়ে। আর কোন উপায় নেই দেখে লাথি মেরে খুলে ফেলল দরজাটা, স্যাঁৎ করে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

একটা হলওয়েতে রয়েছে রানা, এখান থেকে দুই বিল্ডিঙের মাঝখানের খোলা হলরূমে যাওয়া যায়। ছুটল ও, টপ লেভেল ব্রিজে উঠে এল। অপরপ্রান্তে লীনাকে দেখা গেল, দেয়ালের দিকে পিঠ, চেষ্টা করছে কারও চোখে ধরা না পড়ার। মেয়েটার চোখের দৃষ্টিই রানাকে বলে দিল, বিপদের মধ্যে আছে সে। অকস্মাৎ নিচের তলায় দু'জন গার্ডকে দেখতে পেয়ে লাফ দিয়ে সরে গেল রানা, পরক্ষণে এক ঝাঁক বুলেট এসে লাগল রেইলিঙের গায়ে।

গার্ডদের দৃষ্টি রানার ওপর, এই ফাঁকে কোমরে আটকানো ব্যান্ড থেকে একটা তার খুলল লীনা, রেইলিঙে আটকাল সেটা, তারপর রেইলিং টপকে লাফ দিল নিচে। শুরু হলো পতন, কোমরের ব্যান্ড থেকে লম্বা হচ্ছে তার। হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকল রানা, চোখাচোখি হতে হাত নাড়ল লীনা। গার্ডদের পিছনে ধীর গতিতে নামল সে, পরমুহূর্তে একটা প্যাসেজে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। এখনও গার্ডরা রানার দিকে গুলি করছে।

ব্রিজ ধরে ছুটল রানা। বুলেটগুলো পিছু নিল ওর। দৈত্যাকার প্রেস রূমে ঢুকে পড়ল। বিকট শব্দে মেশিন চলছে, রানার জন্যে সুবিধেই হলো। কয়েকজন গার্ড পিছু ধাওয়া করল, লম্বা ঝুল-

বারান্দায় বেরিয়ে এসে ছুটছে ও। শেষ প্রান্তের একটা দরজা খুলে গেল, ঝুল-বারান্দায় বেরিয়ে এল তিনজন গার্ড। আর কোন উপায় নেই, রেইলিঙে উঠে পড়ল রানা, লাফ দিল নিচে, পড়ল প্রকাণ্ড এক ওভারহেড ক্রেনের মাথায়।

ক্রেনের একটা সচল বাহুর ওপর পড়েছে রানা, ওকে নিয়ে নিচে নেমে এল সেটা। নিচে ছাপাখানা, মেশিনের বিকট আওয়াজে কানের পর্দা মনে হলো ফেটে যাবে। এক মেশিন থেকে আরেক মেশিনে কাগজ ঢুকছে, সেই কাগজের নিচে দিয়ে ছুটল রানা, প্রকাণ্ড এক গেট দেখতে পেয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। জায়গাটা বিশাল হ্যাঙ্গারের মত, তবে ভেতরে প্লেন নয়, রোল করা কাগজ সাজানো রয়েছে। প্রতিটি কাগজের রোল এক টন ওজন, একটার ওপর একটা সাজানো। ছোট আকৃতির কয়েকটা ট্রাকও আছে, একটা করে রোল নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঙ্গারের ভেতর ঢুকে ছুটে আসছে গার্ডরা, রানাকে দেখতে পেয়ে গুলি করল। ট্রাক থামিয়ে নিচে লাফিয়ে পড়ল কয়েকজন ড্রাইভার, যে যেদিকে পারল ছুটছে। কোণঠাসা হয়ে পড়েছে রানা, অনেকটা বাধ্য হয়েই কাছাকাছি একটা ট্রাকের ক্যাবে উঠে পড়ল। এই সময় একটা বুদ্ধি ঢুকল মাথায়। ট্রাক নিয়ে প্রথমে একশো আশি ডিগ্রী ঘুরল, তারপর পিছু হটল বেশ খানিকটা। এরপর সামনে ছোটাল ট্রাক, পাহাড়ের মত উঁচু করে সাজানো রোলগুলোর গায়ে ধাক্কা মারবে। ট্রাকের পিছনে এক টনের একটা রোল আছে, অকস্মাৎ ব্রেক করায় ক্যাবের ওপর দিয়ে লাফ দিল সেটা, ধাক্কা খেলো রোলগুলোর স্ত ূপে। সাজানো স্তূপটা ভেঙে গেল, চূড়া থেকে খসে পড়ছে এক টনী রোলগুলো।

স্তূপের পিছনে ছিল গার্ডরা, জান বাঁচানোর জন্যে ঝেড়ে দৌড় দিল তারা। কামান দাগার মত বিকট আওয়াজ তুলে একটা করে রোল মেঝেতে পড়ছে, পড়েই গড়াতে শুরু করছে। একটা রোল চিঁড়ে চ্যাপ্টা করে দিল একজন গার্ডকে। ওই একই রোল ধাক্কা খেলো আরেকটা সিলিং ছোঁয়া কাগজের স্তূপে।

দ্বিতীয় স্তূপটা সরাসরি রানার ওপর নেমে আসছে। ট্রাক নিয়ে সরে যাবার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু সময়ে কুলাবে না বুঝতে পেরে ক্যাব থেকে লাফ দিল ও, ছুটে চলে এল একটা পিলারের আড়ালে। খালি একটা ট্রাক, গতি খুব বেশি, গেটের দিকে ছুটছে, দেখতে পেয়ে ওটার পিছনের কিনারা ধরে ঝুলে পড়ল রানা। ট্রাকটা বেরিয়ে এল লোডিং ডকে, তারপরও থামল না, রানাকে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে কমপ্লেক্সের বাইরে।

রাস্তার ওপার থেকে বিল্ডিঙের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছিল লীনা ওয়াং, রানার পলায়ন চাক্ষুষ করে আপনমনে হাসল। ছুটোছুটি আর গোলযোগের মাঝখানে কারও চোখে ধরা না পড়েই মাত্র এক মিনিট আগে বেরিয়ে এসেছে সে।

হামবুর্গে লীনার কাজ শেষ হয়েছে। চুরি যাওয়া রেডার ডিভাইসটা সে উদ্ধার করতে পারেনি বটে, তবে এখন সে জানে কিভাবে ওটা ব্যবহার করা হয়েছে। অবশ্য ফাউলার আর এফএমজিএন-এর দিকে আঙুল তাক করার আগে আরও প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে তাকে।

নিজের হোটেলে ফিরে এসে বেইজিঙে, নিজে বসের কাছে রিপোর্ট করল লীনা। বস্ তাকে গোপন একটা তথ্য দিলেন, যা শুধু

চীনা সামরিক বাহিনী জানে। সময় খুবই কম হাতে, কারণ ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজের একটা বহর চীনা উপকূলের দিকে ছুটে আসছে।

নিজের জিনিস-পত্র গুছিয়ে নিয়ে একটা ট্যাক্সি ডাকল লীনা, এয়ারপোর্টে এসে চড়ে বসল একটা প্লেনে। প্লেনটা দূর-প্রাচ্যের দিকে যাবে। প্লেনে বসে রানার কথা ভাবল লীনা। একজন চীনা হিসেবে সে বিশ্বাস করে, মানুষের নিয়তি পূর্ব-নির্ধারিত। কোন কারণ নেই, তারপরও অনুভূতিটা প্রবল, ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে আবার তার দেখা হবে।

ছয়

হোটেল আটলান্টিকের উল্টোদিকের একটা বিল্ডিঙের ছাদে বসে রয়েছে মেনাচিম, গলায় ঝুলছে বিনকিউলার, হাতে ওয়াকি-টকি। নিজেদের কমপ্লেক্সে এক লোককে সিকিউরিটির দায়িত্ব দিয়ে এসেছে সে, এইমাত্র তার রিপোর্ট পেল- মাসুদ রানা সবাইকে ঘোল খাইয়ে পালিয়ে গেছে। গার্ডদের ছ'জন পেপার রোলের নিচে চাপা পড়ে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে, মারা গেছে তিনজন। রাগে কান দিয়ে গরম ধোঁয়া বেরুচ্ছে মেনাচিমের। মনে মনে প্রার্থনা করছে, হে ঈশ্বর, লোকটাকে এইটুকু কুবুদ্ধি অন্তত দাও তুমি, সে যাতে হোটেলে অর্থাৎ পামেলার কাছে ফিরে আসে।

রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে মেনাচিম, রানার বিএমডব্লিউটাকে দেখা গেল। ওয়াকি-টকি মুখের সামনে তুলে কয়েকটা জরুরী নির্দেশ দিল সে।

গ্যারেজে ঢুকে র‍্যাম্প বেয়ে উঠে এল বিএমডব্লিউ, ছাদের চিহ্নিত একটা জায়গায় থামল। দরজার পাশে গোপন একটা কমবিনেশন সেফ আছে, দ্রুত ডায়াল ঘুরিয়ে সেটা খুলে ফেলল

রানা, ভেতরে রেখে দিল লাল বাক্সটা। সেফ বন্ধ করে আবার ডায়াল ঘোরাল, তারপর বন্ধ করে দিল গোপন প্যানেল।

হাতে সেল ফোন নিয়ে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল রানা। চাপ দিল সাতটা বোতামে, সাত রকম আওয়াজ করে সাড়া দিল গাড়ি। এরপর শান্তভাবে গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে এল ও, হোটেলের দিকে হাঁটছে। এখন কাজ বলতে লন্ডনে দ্রুত একটা রিপোর্ট পাঠানো, পামেলাকে আরও খানিক সময় দেয়া, ব্যস। ফাউলারের লোকজন ওর খোঁজ পাবার আগেই জার্মানী ছেড়ে চলে যাবে ও।

বিনকিউলারে চোখ, রানাকে দেখতে পাচ্ছে মেনাচিম। কার পার্কের উল্টোদিকে তার লোকজন রয়েছে, সাদা পোশাকে। ওয়াকি-টকি তুলে আরও কয়েকটা নির্দেশ দিল সে। একটা টো ট্রাক নিয়ে লোকগুলো কার পাথ-এর দিকে এগোল। আশপাশের গলি থেকে আরও কিছু লোক বেরিয়ে এল, হোটেলটাকে ঘিরে ফেলছে।

হোটেলে ঢুকে নিজের স্যুইটের সামনে চলে এল রানা। ভেতর থেকে কার যেন গলা ভেসে আসছে, ঠিক চিনতে পারল না। দরজায় হালকা নক করল, কিন্তু কেউ সাড়া দিচ্ছে না। ওয়ালথারটা বের করে সাবধানে দরজা খুলল ও।

টেলিভিশনটা সিটিংরূমে, মিষ্টি একটা নারীকণ্ঠ ভেসে আসছে ওটা থেকে। খবর পড়ছে মেয়েটা, বলছে, 'নিরাপত্তা পরিষদের আহ্বানে বেইজিং বা লন্ডন এখন পর্যন্ত কোন সাড়া দেয়নি। এবার, এই মাত্র খবর পাওয়া গেছে…'

স্পামেলা?' ডাকল রানা।

টিভিটা বন্ধ করতে যাবে ও, খবর পাঠিকাকে বলতে শুনল,

‘...জার্মানীতে হামবুর্গ পুলিস একটা হোটেল কামরা থেকে মিসেস পামেলা ফাউলারের প্রায় বিবস্ত্র লাশ উদ্ধার করেছেন। আপনারা যে নেটওঅর্কের খবর শুনছেন সেই ফাউলার মিডিয়া গ্রুপের মালিক ম্যাডক ফাউলারের স্ত্রী ছিলেন তিনি। পুলিসের ধারণা, এই হত্যাকাণ্ড পরকীয়া প্রেমের করুণ পরিণতি...’

রানার বুক ধড়ফড় করছে। বেডরূমে চলে এল ও, এখানে আরেকটা টিভি চলছে। খবরের প্রতিটি শব্দ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে গোটা স্যুইটে।

বিছানার ওপর নিঃসাড় পড়ে রয়েছে পামেলা। কাছে এসে তার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হলো রানা- মারা হয়েছে গলা টিপে। একাধারে বিস্ময়, রাগ আর শোক অবশ করে তুলল ওকে।

ফাউলারকে ছোট করে দেখা উচিত হয়নি ওর। দেখা হবার আগে তাকে শুধু সন্দেহ করত ও। কিন্তু পরিচয় হবার পর লক্ষ করেছে স্যাটেলাইট নেভিগেশনের প্রসঙ্গটা ওঠা মাত্র লোকটা কেঁপে উঠেছিল। এ থেকেই বোঝা যায় জিপিএস-এ কারিগরি ফলিয়ে নটিংহামকে সাগরের তলায় পাঠিয়ে দিয়েছে সে। বোঝাই যখন গিয়েছিল, আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল ওর।

বিপদটার মধ্যে পামেলাকে টেনে আনায় নিজের ওপর রাগ হলো রানার। পামেলা অভিযোগ করেছিল রানা তার কাছ থেকে তার স্বামীর গোপন তথ্য আদায় করতে চায়। ‘এ তোমার ভুল ধারণা’ বলে যে উত্তরটা দিয়েছিল ও, সেটা মিথ্যে। প্রথম থেকেই এই ইচ্ছেটা ছিল ওর। ও জানত, দেখামাত্র ওর প্রতি আকৃষ্ট হবে পামেলা। তবে জানত না যে ওদের আবার দেখা হওয়ার মানে দাঁড়াবে স্বামীর সঙ্গে তার বিচ্ছেদ।

‘এখান থেকে গুলি করলে সরাসরি আপনার মাথায় লাগাতে পারব,’ নরম সুর, বাথরূমে থেকে ভেসে এল। ‘হাতের অস্ত্রটা খুব সাবধানে, ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখুন, প্লীজ।’ লোকটার গলায় জার্মান টান।

কথা না বলে নির্দেশটা পালন করল রানা।

‘এবার মিসেস পামেলার পাশে বিছানায় শুয়ে পড়ুন। শুয়ে শুয়ে টিভি দেখুন।’

শুলো রানা, টিভির দিকে তাকাল।

খবর পাঠিকা বলছে, ‘ম্যাডক ফাউলার জাকার্তার এফএমজি-এন হেডকোয়ার্টারের পথে প্লেনে রয়েছেন। এরইমধ্যে মর্মান্তিক দুঃসংবাদটা দেয়া হয়েছে তাঁকে। তাঁর একজন মুখপাত্রের ভাষায়, বর্ণনাতীত শোকে কাতর হয়ে পড়েছেন ভদ্রলোক...’

বাথরূম থেকে লোকটা বলল, ‘আমি ড. হফম্যান। পিস্তলে আমার হাত খুব ভাল। অবিশ্বাস করলে ঠকবেন।’

চোখের কোণ দিয়ে রানা দেখল ড. হফম্যান একটা বেডরূম চেয়ারে বসে আছে, হাতে হেকলার অ্যান্ড কোচ পিসেভেন কেথ্রি পিস্তল, সাইলেন্সার লাগানো। বয়েস হবে চল্লিশের মত, লম্বা আর রোগা, মাথার চুল পাতলা হতে শুরু করেছে, চোখে চশমা। চোখ দুটো আধবোজা, দৃষ্টি নিচের দিকে, এ-সব প্রায় নিশ্চিতভাবে জানিয়ে দিচ্ছে লোকটা হোমিসাইডাল ম্যানিয়াক, যে-কোন নৃশংস কাজ করতে পারে।

ড. হফম্যান পামেলাকে শুধু খুন করেনি, খুনটা করার সময় কুৎসিত ও বিকৃত কামনা চরিতার্থ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিল রানা, এই লোককে বেঁচে থাকতে দেবে না। টিভির ওপর চোখ,

নিজেকে মুক্ত করার জন্যে কি কি করার আছে খতিয়ে দেখছে ও।

হতভম্ব হয়ে টিভির খবর পড়া দেখছে রানা। খুঁটিনাটি সমস্ত বিবরণ সহ পুরোদস্তুর একটা নিউজ স্টোরি, যা কিনা এখনও ঘটেনি, অথচ ঘটেছে বলে দাবি করা হচ্ছে।

'যে ভদ্রলাক হোটেল স্যুইটটা ভাড়া নিয়েছিলেন, পুলিস তাঁর লাশও আবিষ্কার করেছে,' খবর পাঠিকা বলে চলেছে, 'সম্ভবত নিজের গুলিতে নিজেই নিহত। এই খুন ও আত্মহত্যার মোটিভ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করতে রাজি হয়নি পুলিস। এফএমজিএন-এর আমরা সবাই গভীর শোকে...'

টিভি বন্ধ করে দিয়ে ড. হফম্যান বলল, 'খবরটা প্রচার করা হবে এখন থেকে এক ঘণ্টার মধ্যে। রিপোর্ট করা হয়েছে, আশা করা যায় হোটেলের পথে রওনা হয়ে গেছে পুলিস।'

'আগাম খবর,' বিড়বিড় করল রানা। চিন্তা করছে ও। ডাক্তার হফম্যান যথেষ্ট দূরে রয়েছে, লাফ দিয়ে তাকে কাবু করা সম্ভব নয়, তার আগেই গুলি হবে।

'মেয়েটা যথেষ্ট বুদ্ধিমতী,' ড. হফম্যান বলল, 'কিন্তু নিউ ইয়র্কে বোনের সঙ্গে কথা বলে বোকামি করেছে। ও কি জানত না যে ওভারসীজ কল রিলে করে তার স্বামীর স্যাটেলাইট?'

'ওখান থেকে আমাকে গুলি করলে আত্মহত্যা বলে মনে হবে না।' চিন্তা করার জন্যে আরও সময় দরকার রানার।

'মি. রানা, আমি ফরেনসিক মেডিসিনের প্রফেসর। এখান থেকে গুলি করেও আপনার হাতে যথেষ্ট পাউডার বার্ন-এর ব্যবস্থা করতে পারব, এমনকি ক্ষতটার চারধারে পোড়া দাগও থাকবে।'

'তারমানে কি এটা আপনার হবি?'

'আরে না!' আহত দেখাল প্রফেসরকে। 'আমাকে খুব ভাল বেতন দেয়া হয়। সারা দুনিয়ায় কাজ পাই আমি। আমার বৈশিষ্ট্য হলো, বিখ্যাত সব লোকজনকে ওভারডোজ দিয়ে মেরে ফেলা। এবার...'

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল সে, 'মি. মেনাচিম, আপনি কি আমার কানের পর্দা ফাটাতে চান?'

বুঝতে এক সেকেন্ড সময় নিল রানা, হফম্যান তার এয়ারফোন ওয়াকি-টকিতে কথা বলছে।

'আপনি কি সিরিয়াস?' মেনাচিমকে জিজ্ঞেস করল হফম্যান। 'হকিস্টিকেও কাজ হচ্ছে না? হাত বাড়ালেই ইলেকট্রিক শখ খাচ্ছে গার্ডরা? গুলি করলে বুলেট ফিরে আসছে? ওহ্ গড! ঠিক আছে, অপেক্ষা করুন, জিজ্ঞেস করছি।'

রানার দিকে তাকাল হফম্যান। 'বিব্রতকর একটা পরিস্থিতি, মি. রানা। ওরা বলছে, আপনার গাড়িতে একটা লাল বাক্স আছে। ওটা ওদের দরকার। কিন্তু আপনার গাড়ির অ্যালার্ম অফ করতে পারছে না। ওরা জানতে চাইছে কিভাবে ওটা বন্ধ করতে হয়।'

মনে মনে হাসল রানা। সুযোগ একটা আসছে। 'কাজটা একটু জটিল।'

'আপনি চান আপনাকে আমি টরচার করি?'

'এ বিষয়েও কি ডক্টরেট করেছেন?'

দাঁত বের করে হাসল হফম্যান। 'না। এটা হবি।'

'অ্যালার্মটা সেল ফোনের সাহায্যে বন্ধ করতে হয়।' মেঝেতে ফেলে দেয়া জ্যাকেটের দিকে হাত বাড়াল রানা।

'না!' পিস্তল তাক করল হফম্যান। 'যা করার আমি করব।' অত্যন্ত সাবধানে, রানার কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রেখে, জ্যাকেটটা মেঝে থেকে তুলল সে, পকেট থেকে বের করল সেল ফোনটা। জ্যাকেটটা ফেলে দিয়ে হাতের ফোন উঁচু করল। 'কি করতে হবে?' জিজ্ঞেস করল রানাকে। 'কোন চালাকি করবেন না।'

'রিকল বাটনে তিনবার চাপ দিন,' বলল রানা।

রানার মুখে কি যেন খুঁজল হফম্যান। রিকল বাটনে তিনবার চাপ দিল সে। সঙ্গে সঙ্গে স্টান গান বিস্ফোরিত হলো তার হাতে। চেঁচিয়ে উঠে ফোনটা ফেলে দিল সে, ইতিমধ্যে বিছানা থেকে লাফ দিয়েছে রানা। হফম্যানের পিস্তল ধরা হাতটা ধরে ফেলল ও। ধস্তাধস্তি শুরু হলো, মেঝেতে পড়ে গিয়ে দু'জনই গড়াগড়ি খাচ্ছে। হফম্যানের পিস্তল ধরা হাতের কব্জি ছাড়েনি রানা, এক পর্যায়ে মাজলটা প্রফেসরের খুলিতে ঠেকল।

'থামুন!' আতঙ্কে বিকৃত শোনাল হফম্যানের গলা। 'মারবেন না, প্লীজ। আমি স্রেফ একজন প্রফেশনাল, নির্দেশ পালন করছি।'

'আমিও তাই,' বলল রানা। ট্রিগার টেনে দিল ও, হফম্যানের খুলি আক্ষরিক অর্থেই বিস্ফোরিত হলো।

সিধে হলো রানা। ওর আসলে মানুষ মারতে কখনোই ভাল লাগে না। অথচ অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বা দায়িত্ব কাজটা করতে বাধ্য করে ওকে। ওর জীবনে এমন দু'চারটে দৃষ্টান্তও আছে, যখন ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ খুন করেছে। দায়িত্ব বা কর্তব্য পালনে খুঁত রাখা ওর স্বভাব নয়, তবে কখনোই ব্যাপারটা উপভোগ করে না। মানুষ মারার পর তৃপ্তির বা সন্তুষ্টির অনুভূতি হয়েছে এমন ঘটনা ওর জীবনে বিরল। আজকের এই ঘটনাটা অবশ্য ওই শ্রেণীতে পড়ে।

হফম্যানকে খুন করায় পামেলা ফিরে আসবে না ঠিকই, তবে পামেলার পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নেয়ার প্রয়োজন ছিল।

পিস্তল ফেলে হফম্যানের জ্যাকেট দিয়ে মুখের রক্ত মুছল রানা, তারপর বিছানার পাশে গেল শেষবার পামেলাকে দেখার জন্যে। মেয়েটার কপালে হালকা একটা চুমো খেলো ও। এই সময় দরজায় ঘুসি মারল কেউ। তারপর চিৎকার শোনা গেল। জার্মান ভাষায় বলছে, 'আমরা পুলিস, দরজা খুলুন।'

দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকতে হবে ওদেরকে। ভেতরে দুটো লাশ ছাড়া আর কিছু পাবে না।

ঝুল-বারান্দা থেকে পাইপ বেয়ে নিচে নামল রানা, সেখান থেকে পাঁচিল টপকে হোটেলের পিছনের গলিতে বেরিয়ে এল।

বিনকিউলারে চোখ, রানাকে পালাতে দেখছে মেনাচিম। ওয়াকি-টকিতে দ্রুত কথা বলছে সে।

গ্যারেজের র‍্যাম্প বেয়ে ছুটছে রানা। দূর থেকেই দেখতে পেল ফাউলারের গার্ডরা এখনও ওর বিএমডব্লিউ ভাঙার চেষ্টা করছে। সেল ফোন বের করে একটা বোতামে চাপ দিল ও।

গাড়িটা থেকে বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে এল টিয়ার গ্যাসের ঘন, ঝাঁঝাল মেঘ। বিষম খেলো গার্ডরা, চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে আসছে। দ্রুত পিছু হটল সবাই। আরেক পাশের কয়েকজন গার্ড রানাকে দেখতে পেয়ে হোলস্টার থেকে অস্ত্র বের করল। সেল ফোনের আরেকটা বোতামে চাপ দিতে বিএমডব্লিউ গর্জে উঠল।

হেডলাইট জ্বলছে, কংক্রিটের সঙ্গে চাকা ঘষে পিছু হটল গাড়ি, টিয়ার গ্যাসে আক্রান্ত গার্ডদের ধাওয়া করছে। দু'সেকেন্ড পর গিয়ার বদলে রানার দিকে ছুটে এল সেটা। আরেক পাশের

লোকগুলো যখন গুলি করতে যাচ্ছে। গাড়ির বুলেটপ্রুফ শরীরের আড়ালে মাথা নিচু করল রানা।

খুলির পাশ দিয়ে একটা বুলেট বেরিয়ে গেল। চমকে উঠে পিছনে তাকাতেই র‍্যাম্পে একজন লোককে দেখতে পেল রানা, হাতে পিস্তল নিয়ে ওর দিকেই ছুটে আসছে। গাড়ির কাছাকাছি দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকল ও। আরও দুটো বুলেট ছুটে এল, লাগল গাড়ির গায়ে।

পিছনের সীটের নিচে লুকিয়ে রয়েছে রানা, তবে সেল ফোনের খুদে মনিটরে গাড়ির সামনেটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। গ্যারেজের ভেতরে, র‍্যাম্পে আর রাস্তায়, সব মিলিয়ে বিশ কি পঁচিশজন সশস্ত্র গার্ড আছে, আন্দাজ করল ও। বিএমডব্লিউতে রকেট ছাড়াও নানারকম অস্ত্র আছে, ইচ্ছে করলে সব ক'টাকে মেরে ফেলতে পারে ও। তা না মেরে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যাওয়ারই ইচ্ছে ওর। যাচ্ছেও তাই, কিন্তু দেখা গেল মেনাচিমের নির্দেশে তার গার্ডরা র‍্যাম্পের নিচে দাঁড়িয়ে নাইন মিলিমিটার সাব-মেশিন গান তাক করছে ওর দিকে।

গাড়ি ঘুরিয়ে নিল রানা, র‍্যাম্প বেয়ে উঠে যাচ্ছে গ্যারেজের টপ ফ্লোরে। ছ'তলায় উঠে এসে গোটা চত্বরটা ফাঁকা দেখল রানা। গার্ডরা পিছু নিয়েছে, জানে ও। তারা টপ ফ্লোরে উঠে আসার আগেই গোপন প্যানেল থেকে অ্যাকসেস ডিভাইসটা বের করে পকেটে ভরল। পরমুহূর্তে স্পীড বাড়িয়ে দিয়ে দরজা খুলে নেমে পড়ল। রেলিং ভেঙে ছ'তলা থেকে নিচে লাফ দিল গাড়ি। ডানা গজায়নি, তবু শূন্যে উড়ছে বিএমডব্লিউ। রাস্তার ঠিক কোথায় পড়ল দেখার জন্যে অপেক্ষা করল না, সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে

নিচে নেমে আসছে রানা।

গ্যারেজের কোন লেভেলেই গার্ডরা নেই, র‍্যাম্প বেয়ে রাস্তায় বেরিয়ে গেছে। রাস্তার উল্টোদিকের একটা বিল্ডিঙের গায়ে সরাসরি ধাক্কা খেয়ে কয়েকটা জানালা চুরমার করে দিয়েছে বিএমডব্লিউ, তারপর খসে পড়েছে নিচের ফাঁকা ফুটপাথে। রাস্তায় যানবাহন থেমে গেছে, চারদিক থেকে ছুটে আসছে লোকজন। র‍্যাম্প থেকে নিচে নেমে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল রানা, উল্টো দিকের ছাদ থেকে ওকে দেখতে পেল শুধু মেনাচিম। কিন্তু এখন আর করার কিছু নেই তার, ওয়াকি-টকিতে ডেকেও কোন গার্ডের সাড়া পাচ্ছে না সে। তার লোকজন সেট অফ করে বিএমডব্লিউ-এর দিকে ছুটছে।

ভিড় ঠেলে একটা পার্কিং লটে চলে এল রানা, লাল একটা টয়োটার ইগনিশনে চাবি দেখতে পেয়ে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল, দরজা খুলে উঠে বসল সীটে।

টয়োটা নিয়ে চলে যাচ্ছে রানা, দেখতে পেয়ে অশ্রাব্য গালি দিল মেনাচিম। দুশ্চিন্তা হচ্ছে তার, মাসুদ রানাকে ধরতে না পারায় বস্ তাকে এক হাত নেবেন।

এফএমজিএন টিভি নেটওঅর্ক থেকে যা-ই ঘোষণা করা হোক, হামবুর্গে বসেই স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ পেয়েছে ম্যাডক ফাউলার। মেনাচিম আর ড. হফম্যানকে রানার স্যুইটে রেখে সরাসরি এয়ারপোর্টে চলে আসে সে, সঙ্গে ছিল টেকনো-টেরোরিস্ট খায়রুল কবির। ব্যক্তিগত জেট প্লেনে বসে অপেক্ষা করছিল, আশা মাসুদ রানা হয় ধরা পড়বে, নয়তো ওর মৃত্যু সংবাদ দেয়া

হবে তাকে। কিন্তু কোনটাই ঘটেনি। এয়ারপোর্টে এসে মেনাচিম তাকে রিপোর্ট করল, রানা পালিয়েছে, লাল বাক্সটাও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

প্লেন আকাশে উঠল, জাকার্তার পথে রওনা হয়ে মুম্বাইতে রিফুয়েলের জন্যে থামবে। ফাউলার গভীর চিন্তায় মগ্ন। দু'বার তার মনোযোগ আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে কবির। পিছনের সীটে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে মেনাচিম।

মুম্বাই পর্যন্ত কারও সঙ্গে কথা বলল না ফাউলার। ফুয়েল নেয়ার পর আবার যখন আকাশে উঠল জেট, মেনাচিমের ঘুম ভাঙাল সে। বলল, 'মাসুদ রানা এরপর কোথায় যাবে, আমি আন্দাজ করতে পারছি। আমি চাই সেখানে হাজির থাকবে তুমি, তার একটা পাকা ব্যবস্থা করবে। এবার যদি ব্যর্থ হও, তোমার সার্ভিস আর আমার দরকার হবে না।'

মেনাচিম কিছু বলতে যাচ্ছিল, কড়া ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে দিল ফাউলার। 'কোন কথা নয়!'

কবিরের দিকে ফিরল সে, বলল, 'অনেক চিন্তা-ভাবনা করে আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

'মাসুদ রানা সম্পর্কে?' জিজ্ঞেস করল কবির।

'শুধু মাসুদ রানা সম্পর্কে নয়,' বলল ফাউলার। 'বাংলাদেশ সম্পর্কেও।'

কবির হতভম্ব। 'বুঝলাম না। এর মধ্যে বাংলাদেশ কোত্থেকে এল?'

চোখ গরম করে কবিরের দিকে তাকাল ফাউলার। 'আপনিই আমাকে জানিয়েছেন, বাংলাদেশ দরিদ্র একটা দেশ, কিন্তু দেশটার

কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স গোটা দুনিয়ার আন্ডারগ্রাউন্ড ক্রিমিনাল আর টেরোরিস্টদের জন্যে আতঙ্ক বিশেষ। বলেননি?'

'তা বলেছি...'

'আরও বলেছেন, একবার যখন আমার বিরুদ্ধে লেগেছে ওরা, এর একটা সুরাহা না করা পর্যন্ত থামবে না।'

'হ্যাঁ, কিন্তু...'

'বাংলাদেশ জাতিসংঘের অ্যান্টি-টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনের সদস্য, ঠিক? দুনিয়ার প্রায় সব বড় শহরে বিসিআই-এর কাভার রানা এজেন্সির শাখা অফিস আছে, ঠিক? তার ওপর, আপনাকেও ওরা খুঁজছে। কাজেই আমি যদি বাংলাদেশকে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করি, আমাকে আপনি দোষ দিতে পারেন না।'

'আপনার কথায় যুক্তি আছে, মানলাম,' বলল কবির। 'কিন্তু তারপরও কথা থাকে। বিসিআইকে ছোট করে দেখা উচিত হবে না।'

'কে ছোট করে দেখছে? বরং উল্টোটাই সত্যি। সিআইএ বা ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসকে আমি কেয়ার করি না, ইন্টারপোলকেও গোনার মধ্যে ধরি না।' বড় করে একটা শ্বাস নিল ফাউলার। 'একের পর এক বড় বড় অনেকগুলো প্রজেক্টে হাত দিতে যাচ্ছি আমরা, কাজেই প্রধান শত্রুপক্ষকে কেটে-ছেঁটে ছোট করে রাখতে চাই, কাজের সময় যাতে ঝামেলা না করে।'

'ঠিক কি করতে চাইছেন বলবেন আমাকে?' কবিরকে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে।

'তার আগে বলুন, আপনি এত ভয় পাচ্ছেন কেন?' কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করল ফাউলার।

‘ভয় পাবার কারণ আছে, মি. ফাউলার,’ ভারী গলায় বলল কবির। ‘মাসুদ রানা একাই একশো। ওর সঙ্গে যে-ই লাগতে গেছে সে-ই ধ্বংস হয়ে গেছে। আপনি বরং আমার পরামর্শ...’

‘কি সেটা?’

‘অন্তত এখুনি মাসুদ রানাকে ঘাঁটাবেন না, প্লীজ,’ কবিরের গলায় আবেদনের সুর। ‘চীন আর ব্রিটেনকে ভুল বুঝিয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়ার আমাদের এই প্ল্যান আসুন বাতিল করি। আমাদের এখন উচিত আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যাওয়া। এফএমজিএন তার বৈধ কর্মসূচী নিয়ে কাজ করতে থাকুক। পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হোক, তারপর নতুন করে শুরু করব আমরা।’

রাগে লাল হয়ে উঠছে ফাউলারের চেহারা। ‘অথচ আপনাকে আমি অত্যন্ত সাহসী বলেই জানতাম!’

অহমিকায় ঘা লাগল কবিরের, বলল, ‘আমার সাহস কারও চেয়ে কম নয়, মি. ফাউলার। কিন্তু মাসুদ রানা বা বিসিআইকে সাহস দেখাতে যাওয়াটা বোকামি। তাছাড়া, আরও একটা ব্যাপারে আমার আপত্তি আছে।’

‘আরও একটা ব্যাপারে মানে?’

‘প্রোবিং মেশিন উঁকি আমার তৈরি, মি. ফাউলার,’ বলল কবির। ‘অ্যাকসেস ডিভাইসটাও আফগানিস্তান থেকে আমি কিনে এনেছি। প্রথম থেকেই আমি চেয়েছি জিপিএস-এ কারিগরি ফলিয়ে গভীর সমুদ্রের জাহাজগুলোকে বিপথে এনে ডুবিয়ে দেব, তারপর ওগুলোর মূল্যবান কার্গো উদ্ধার করে আনব। তাতেই প্রতি বছর কয়েক বিলিয়ন ডলার আয় হবে। কিন্তু আমার টেকনলজি ব্যবহার করে আপনি দুনিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অশান্তি

আর হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে চাইছেন। এর পরিণতি খারাপ হতে বাধ্য।'

বেতনভুক কর্মচারী প্রকাশ্যে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চাইছে দেখে ফাউলার যতটা না রাগল, তারচেয়ে বেশি হলো বিস্মিত। কিছুক্ষণ চিন্তা করল সে। টেকনো-টেরোরিস্ট খায়রুল কবির দুনিয়ায় মাত্র একজনই আছে, তাকে সে হারাবার ঝুঁকি নিতে পারে না। কবির তাকে ছেড়ে চলে গেলে অনেক প্রজেক্টই বাতিল করে দিতে হবে। আপস করার জন্যে মানসিক প্রস্তুতি নিল সে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও। 'ঠিক আছে, চীন আর ব্রিটেনকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়ার প্ল্যানটা আমি বাতিল করে দিলাম। আপনাকে নিয়ে জাহাজ ডোবাবার কাজটাই হবে আমার প্রধান পেশা। কিন্তু...'

'কিন্তু?'

'মাসুদ রানা আমাকে খেপিয়ে তুলেছে,' বলল ফাউলার। 'আমি প্রতিশোধ নেবই।'

'কিন্তু...আচ্ছা, বলুন, কিভাবে প্রতিশোধ নিতে চান।'

'নটিংহাম থেকে যে ক্রুজ মিসাইলটা উদ্ধার করা হয়েছে তাতে একটা নিউক্লিয়ার ওঅরহেড আছে। আমি ওটা ঢাকায় ফেলতে চাই।'

আতঙ্কে বোবা হয়ে গেল কবির, কথাই বলতে পারল না।

'আপনার কোন আপত্তি নেই তো?' ফাউলারের গলায় বিদ্রূপ।

'কিন্তু এ তো স্রেফ পাগলামি, মি. ফাউলার!' প্রতিবাদ করল কবির। 'ঢাকায় প্রায় এক কোটি লোকের বাস। নিউক্লিয়ার বোমা ফাটলে কেউ তারা বাঁচবে না। এত লোককে মারবেন আপনি, বিনিময়ে কি পাবেন? এ তো কোন ব্যবসায়ীর কথা হলো না!'

‘ব্যবসা জাহান্নামে যাক,’ হিসহিস করে বলল ফাউলার। ‘প্রতিশোধ, প্রতিশোধ নিতে চাই।’

‘কিন্তু পরিণতি? ভেবে দেখেছেন, তারপর কি হবে?’

গলা ছেড়ে হেসে উঠল ফাউলার। ‘তারপর কি হবে মানে? আমার হাতে নিউক্লিয়ার অস্ত্র আছে ভেবে দুনিয়ার সবাই আমাকে ভয় করবে। আর সেটাই তো চাই আমি।’

‘আমি আপনার সঙ্গে একমত নই, কারণ…’

‘কারণটা আমি আন্দাজ করতে পারছি, মি. কবির,’ বললেন ফাউলার, হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠেছেন। ‘আপনি বাংলাদেশী, ওখানে আপনার অনেক আত্মীয়-স্বজন আছে। তবে চিন্তার কিছু নেই, তাদেরকে সময় দেয়া হবে। গোপনে খবর পাঠান ঢাকায়, তারা যাতে সরে যেতে পারে। আর যদি দেশপ্রেমের মত সস্তা ভাবাবেগ এখনও আপনাকে ভোগায়, ও-সব বাজে জিনিস থেকে মুক্ত হবার এখনই সময়।’

ক্রূর, নিষ্ঠুর হাসি ফুটল তরুণ টেরোরিস্ট কবিরের ঠোঁটে। ‘দেশপ্রেম? হাহ্! ওই রোগ আমার কোনকালেই ছিল না, মি. ফাউলার। সত্যি কথা বলতে কি, আমিও দেখতে চাই মাসুদ রানা আর বিসিআই ধ্বংস হয়ে গেছে। কারণ আমার বাবা কবির চৌধুরী ছিলেন উপমহাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী, তাঁকে ওরা একদিনের জন্যেও শান্তি পেতে দেয়নি। মাসুদ রানা মারা গেলে বা বিসিআই হেডকোয়ার্টার ধুলোর সঙ্গে মিশে গেলে আমার চেয়ে বেশি খুশি কেউ হবে না। আমি আসলে ভাবছি পরিণতির কথা…’

‘আপনি আমার নির্দেশ মত কাজ করুন, মি. কবির,’ ফাউলার বলল। স্পরিণতি সম্পর্কে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না।’

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে কাঁধ ঝাঁকাল কবির। 'ঠিক আছে, তবে পরে কিন্তু বলতে পারবেন না যে আমি আপনাকে সাবধান করিনি। আরেকটা কথা, মি. ফাউলার...'

'বলে ফেলুন।'

'বাংলাদেশের বিমান ও নৌ-বাহিনীকে যতটা দুর্বল বলে মনে করা হয় আসলে কিন্তু ততটা দুর্বল নয়। গোপন খবর হলো, বাংলাদেশ এয়ার ফোর্সের কাছে মিগ-টোয়েনটিনাইনও আছে, এয়ার-টু-এয়ার মিসাইল সহ। ওগুলো বিশেষ ধরনের মিসাইল, হিট-সীকারস তো বটেই, আবার রিমোট-কন্ট্রোলের সাহায্যে গাইডও করা যায়। ধরুন ওঅরহেড নিয়ে ক্রুজ মিসাইল রওনা হলো, কিন্তু ওদের একটা এয়ার-টু-এয়ার মিসাইল মাঝ-আকাশে বাধা দিল ওটাকে।'

'তো কি হলো? নিউক্লিয়ার ডিভাইসটা হয় ঢাকার আকাশে, নয়তো বঙ্গোপসাগরের ওপরে ফাটবে। ফলাফল তো প্রায় একই হবে।'

'না, হবে না,' বলল কবির। 'কারণ ওদের গাইডেড মিসাইল আমাদের মিসাইলে আঘাত হানবে ঠিকই, তবে হয়তো নিউক্লিয়ার ওঅরহেডে নয়, শুধু ক্রুজে। ওঅরহেডটা তখন সাগরে পড়ে ডুবে যাবে, ফাটবে না।'

তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে ফাউলার বললেন, 'এ-সব আপনার কষ্ট-কল্পনা, বাদ দিন তো!'

'আপনাকে আমার আরও একটা তথ্য দেয়া দরকার,' বলল কবির। 'ওই বিশেষ ধরনের মিসাইল ওদের নৌ-বাহিনীর কয়েকটা গান-বোটেও রাখা হয়েছে। সে-রকম দুটো গান-বোট বর্তমানে

শ্রীলংকায় রয়েছে- শুভেচ্ছা সফরে।'

গুরুত্ব না দিয়ে ফাউলার অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল।

সাত

ল্যান্ড করার অনুমতি পাওয়ার আগে ইউএস এয়ার ফোর্স এসএইচ-থ্রী সী কিং হেলিকপ্টারটা ল্যান্ডিং প্যাডের মাথার ওপর বার কয়েক চক্কর দিল। মূল বেস থেকে খানিকটা দূরে প্যাডটা, ইউএস এয়ার ফোর্সের এক স্কোয়াড মিলিটারি পুলিস অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক পাশে, সঙ্গে দু'জন সিভিলিয়ানও আছে। হেলিকপ্টারে একজন ভিআইপি আসছেন, তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যেই এই আয়োজন।

অনেক দিন পর আবার জাপানে এল রানা। এর আগে ওকিনাওয়া-তে মাত্র একবার এসেছে ও। সী কিং থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল ওকে, পরনে রয়্যাল নেভীর ইউনিফর্ম। ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের অনারারি উপদেষ্টা ও, ফিল্ডে ওদের এজেন্ট হয়ে কাজ করার জন্যে কাভার হিসেবে এখনও কমান্ডার পদটা ব্যবহার করতে দেয়া হয় ওকে। মিলিটারি পুলিসরা ওকে স্যালুট করল, সাড়া দেয়ার জন্যে খায়রুল কবিরের লাল বাক্সটা বাম হাতে নিল রানা।

সার্জেন্ট হুঙ্কার ছাড়ল, 'অ্যাট ঈজ!'

দীর্ঘদেহী একজন সিভিলিয়ান, দেখেই বোঝা যায় সিআইএ, এগিয়ে এল। 'হাই, নারা। অনেক দিন পর দেখা। কথাটা ভুলিনি, তোমার কাছে আমি ঋণী,' লোকটার কথায় টেক্সাসের টান।

রবার্ট মিথের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল রানা। অতীতে একসঙ্গে কাজ করেছে ওরা, রাশিয়ায়। সিআইএ-তে রানার অনেক শত্রু থাকলেও, বন্ধুর সংখ্যাও কম নয়, রবার্ট মিথ তাদেরই একজন। রানার নাম উল্টো করে উচ্চারণ করা তার একটা উদ্ভট খেয়াল। তবে এজেন্ট হিসেবে প্রথম শ্রেণীর সে, সর্ব মহলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে।

'ওটা তুমি আনতে পেরেছ?' জানতে চাইল রানা।

'মারভিন লংফেলো স্বয়ং আমাকে ফোন করেছেন, বাড়িতে,' দাঁত বের করে হাসছে মিথ। 'এ যে আমার জন্যে কত বড় সম্মান!' পাশে দাঁড়ানো দ্বিতীয় সিভিলিয়ানের দিকে তাকাল সে। 'নারা, ইনি ড. রেমন্ড, আমাদের ল্যাব প্রধান- ওঁর ল্যাবেই গোটা ব্যাপারটা তৈরি হয়েছে।' ড. রেমন্ডের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল রানা।

'ঠিক আছে, রেমন্ড, বের করো ওটা,' হাসিখুশি মিথ নির্দেশ দিল।

এমন আঁতকে উঠে মিথের দিকে তাকালেন রেমন্ড, মিথ যেন পাগল হয়ে গেছে। 'বের করব? এখানে? কি বলছ!'

ঠোঁট টিপে অসহায় ভঙ্গি করল মিথ। 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা এয়ার ফোর্স বেসে রয়েছি আমরা। সঙ্গে রয়েছে বিশজন সশস্ত্র গার্ড। তুমিই বলো, এখানে কি ঘটতে পারে?'

এক সেকেন্ড চিন্তা করে মাথা ঝাঁকালেন রেমন্ড, এগিয়ে এসে সার্জেন্টকে কিছু বললেন। সার্জেন্ট সগর্জনে নির্দেশ দিল। গার্ডরা একটা আর্মারড ট্রাক থেকে নিচে নামাল বড় আকৃতির একটা কার্ট।

রানাকে একপাশে টেনে নিল মিথ। 'তুমি তো ব্রিটিশদের বন্ধু। আচ্ছা, বলো তো, কোন বুদ্ধিতে ওরা চীনের বিরুদ্ধে লাগতে যাচ্ছে? সংখ্যায় তারা এক বিলিয়ন বেশি, এটা ব্রিটিশরা ভুলে বসে আছে? চাইনীজ মিগ বেসের কাছাকাছি ছ'টা যুদ্ধ জাহাজ পাঠানো কি বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছে?'

'এই একই কথা বলায় মারভিন লংফেলো চাকরি হারাতে যাচ্ছিলেন,' জবাব দিল রানা।

'আচ্ছা, আচ্ছা, তাই তো বলি- তারমানে সরকারের সঙ্গে সিক্রেট সার্ভিসের মতের মিল হচ্ছে না, কাজেই যা করার সিক্রেট সার্ভিসকে একা করতে হচ্ছে। বুঝলাম।'

ড. রেমন্ড ওদেরকে ডাকলেন, 'আসুন, দেখে যান।'

কার্ট-এর ওপর বসে রয়েছে একটা জিপিএস ডিভাইস। হুবহু এই রকমই একটা নটিংহামেও ছিল। ডিভাইসটার পাশে একটা সেফ রয়েছে। সেটা খুলে ভেতর থেকে আরেকটা ডিভাইস বের করলেন ড. রেমন্ড- অ্যাটমিক ক্লক সিগন্যাল এনকোডিং সিস্টেম ডিভাইস। জিনিসটা কার্ট-এর ওপর রাখলেন তিনি। 'আঁতকে ওঠার জন্যে দুঃখিত, তবে কথা হলো এই যে যুক্তরাষ্ট্র সরকার অত্যন্ত সতর্ক প্রহরায় যে-ক'টা জিনিস গোপন রেখেছে, এটা তার মধ্যে অন্যতম,' গম্ভীর সুরে বললেন। 'এই ডিভাইস মাত্র বাইশটা...আ-আ-আ-আ!' এমন চিৎকার জুড়ে দিলেন, হঠাৎ যেন

বিষধর সাপ দেখেছেন।

লাল বাক্স থেকে নিজের অ্যাকসেস ডিভাইসটা বের করে প্রথমটার পাশে রাখল রানা।

'মাই গড!' মিথের চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল।

'এটা হলো তেইশ নম্বর,' বলল রানা। 'সিআইএ-কে আমার তরফ থেকে উপহার। এটা তুমি রেখে দিতে পারো, মিথ, তবে এখন থেকে আমার নাম ঠিকভাবে উচ্চারণ করতে হবে।'

বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে নিয়ে নিজের জিপিএস ইকুইপমেন্টে দুটো অ্যাকসেস ডিভাইসই ফিট করলেন ড. রেমন্ড। রানা ও মিথ তাঁর কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে থাকল। জ্যান্ত হয়ে উঠল মনিটর। একটার ওপর একটা, দুটো বৃত্ত ফুটল স্ক্রীনে, তবে হুবহু এক নয় দুটো। 'কেউ এটার ওপর কারিগরি ফলিয়েছে,' বললেন রেমন্ড। 'দেখুন।'

'ওটা কি একটা জাহাজকে কোর্স থেকে দূরে নিয়ে যেতে পারে?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ,' বললেন রেমন্ড। 'এই সিগনাল আপনি যদি একটা স্যাটেলাইট থেকে পাঠাতে পারেন।'

'ডোবার সময় ক্যাপটেনের ধারণা অনুসারে জাহাজটা কোথায় ছিল তা যদি আপনাকে আমি জানাই, আপনি বলতে পারবেন আসলে ঠিক কোথায় ওটা ডুবেছে?'

'কোন সমস্যাই নয়।'

'ভুলের মার্জিন খুব অল্প পরিসরের মধ্যে হতে হবে,' বলল রানা। 'ধরুন, এখান থেকে রানওয়ের কিনারা।'

তারমানে পঞ্চাশ গজের মত। হাত দুটো তুলে একটা মাপ

দেখালেন রেমন্ড, বড় একটা মাছের আকৃতি। 'এরচেয়ে বেশি এদিক ওদিক হবে না।'

'তাহলে তো দারুণ!' মিথের দিকে ফিরল রানা। 'ওহে, আমার আরও একটা উপকার করতে হবে।'

ইউএস এয়ার ফোর্সের সি-ওয়ানহানড্রেড থারটি সী লেভেল থেকে পাঁচ মাইল ওপরে উঠে এসেছে, ম্যাক্সিমাম সিলিঙ-এর কাছাকাছি। ওকিনাওয়া থেকে সকালে রওনা হয়েছে ওরা, এখন দুপুর, পৌঁছে গেছে দক্ষিণ-পুব এশিয়ার এয়ার স্পেসে।

খোলা দরজার কাছে ডাইভিং গিয়ার পরে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা, বুকে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো ফিন আর পিঠে একটা প্যারাস্যুট। দুই কব্জিতেও দুটো ডিভাইস রয়েছে- অলটিমিটার ও জিপিএস রিসিভার।

চীন আর ব্রিটিশ জাহাজের রেডারকে ফাঁকি দেয়ার জন্যে পাঁচ মাইল ওপর থেকে জাম্প করতে হবে রানাকে, ওই একই কারণে প্যারাস্যুট খুলতে হবে পানির কাছাকাছি নামার পর।

'আর দশ সেকেন্ড!' ঘোষণা করল পাইলট।

গুনে গুনে দশ সেকেন্ড পর প্লেন থেকে লাফ দিল রানা।

মেঘের ওপর পরিবেশটা বরফ বললেই হয়। লাফ দেয়ার সময় চোখ বুজে ছিল রানা, বিশ সেকেন্ড পর চোখ খুলে প্রথমেই কব্জিতে বাঁধা অলটিমিটারের দিকে তাকাল। কাঁটাটা জিরো-র দিকে সরে যাচ্ছে। এরপর তাকাল জিপিএস ডিভাইসটার দিকে। স্ক্রীনে ক্রস হেয়ার টার্গেট আছে, লাল একটা আলোকিত বিন্দু সেন্টার থেকে অনেক দূরে মিটমিট করছে।

শূন্যে শরীর ঝাঁকিয়ে টার্গেটের কাছাকাছি যাবার চেষ্টা করল রানা। ধীরে ধীরে ক্রস হেয়ার সেন্টারের দিকে লাল বিন্দুটা এগোল, এই মুহূর্তে মেঘের ভেতর ঢুকছে ও। মেঘের এক একটা স্তূপ আকারে বহুতল ভবনের মত, সেগুলোকে ভেদ করে নিচে খসে পড়ছে শরীরটা। হঠাৎ করেই খুলে গেল মেঘের পর্দা, চোখ ধাঁধানো নীল সাগর দেখা গেল নিচে। অবিশ্বাস্য বেগে ছুটে আসছে ওর দিকে।

প্যারাস্যুট খুলতেই একটা ঝাঁকি খেলো রানা। পতনের গতি অকস্মাৎ কমে গেল। তারপরই পানিতে পড়ল ও, একদম খাড়াভাবে। ছলকে উঠল পানি, তবে আশপাশে কোন মানুষজন বা জলযান নেই যে ওকে দেখতে পাবে।

মাথা ওপরে, নিচে পা, এভাবে একশো ফুট নামার পর নিজেকে উল্টো করে নিল রানা, তারপর ফিন আটকাল পায়ে। দৃষ্টিসীমা মাত্র ছয় মিটারের মত। জলজ প্রাণীর সংখ্যা খুব বেশি নয়, কারণটা সম্ভবত পরিবেশ-দূষণ। শব্দ বলতে নিঃশ্বাস ফেলার ফলে মাউথপীস থেকে বেরুনো বুদ্বুদের ছন্দোবদ্ধ বিস্ফোরণ। অচেনা অদ্ভুত এক জগতে বহিরাগত ও সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ লাগছে নিজেকে। রানা ধারণা করল মহাশূন্যে বিচরণ করার সময়ও এই একই অনুভূতি হবে ওর।

কিন্তু জাহাজটা কোথায়? এখানেই কোথাও থাকার কথা ওটার। ওর আর মারভিন লংফেলোর সন্দেহ যদি মিথ্যে হয়, তাহলে তো নটিংহাম ডোবার জন্যে চীনকেই দায়ী করতে হবে। অলটিমিটারের দিকে তাকাল রানা, দুশো মিটার মার্কে পৌঁছুতে যাচ্ছে।

আরও গভীরে নেমে এসে খোঁজাখুঁজি শুরু করল ও। কাছাকাছি আসতে প্রবাল বা পাথরের মত একটা স্তূপ দেখা গেল। তারপর বোঝা গেল, না, ওটা আসলে একটা বিধ্বস্ত মিগের নাক। সাগরের মেঝেতে আরও সব ভাঙা টুকরো ছড়িয়ে রয়েছে। পরীক্ষা করে দেখল রানা, মিসাইল আঘাত হানার সমস্ত লক্ষণ স্পষ্ট চোখে পড়ল। প্লেনের বাকি অংশের খোঁজ পাওয়া গেল না।

নাকটার পিছন দিয়ে ককপিটে ঢুকল ও। সীটেই রয়েছে পাইলট, স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো। হাত দুটো পানিতে ভাসছে, দেখে মনে হচ্ছে উড়তে চায়। ছোট মাছেরা চোখ দুটো খেয়ে ফেলেছে। উইন্ডস্ক্রীন আর কন্ট্রোল প্যানেল চুরমার হয়ে গেছে।

মিগটাকে পাওয়ায় ওর আর বিসিসি চীফের সন্দেহ সত্যি প্রমাণিত হলো। নটিংহাম যেখানে আছে বলে দাবি করেছিল চীনারা সেখানেই ওটা ডুবেছে। ভুল তথ্য দিয়ে বিপথে আনা হয় ক্রুদের, তারা মনে করেছিল আরেক জায়গায় আছে। এর জন্যে যদি ফাউলার দায়ী হয়, তার উদ্দেশ্যটা কি? চীন ও ব্রিটেনের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে কি লাভ তার? তাহলে কি গুজবটা সত্যি? হঙকঙ হস্তান্তর হওয়ায় খেপে গেছে ফাউলার? রানা তা বিশ্বাস করে না। এর পিছনে অন্য কোন কারণ অবশ্যই আছে। ফাউলারকে যতটুকু চিনেছে ও, লোকটা শুধু টাকা আর ক্ষমতা বাড়াবার ব্যাপারে আগ্রহী।

ককপিট থেকে বেরিয়ে এসে আবার সাগরের তলায় খোঁজাখুঁজি শুরু করল রানা। সামনে গাঢ় রঙের একটা আকৃতি লক্ষ করে একঝাঁক মাছকে ছুটতে দেখল ও। কৌতূহল হওয়ায় নিজেও এগোল সেদিকে। ছোট একটা পাহাড়ের চূড়া মনে হলো

আকৃতিটাকে। তবে কাছে আসতে পরিষ্কারই চেনা গেল।

জাহাজটাকে পেয়েছে রানা। এইচএমএস নটিংহাম কাত হয়ে পড়ে রয়েছে সাগরের তলায়, পাশেই গভীর একটা খাদের কিনারা।

হ্যালোজেন টর্চ জ্বেলে ফ্রিগেটটার দিকে এগোল রানা। ওটার ভেতরে ঢোকার আগে ডাইভ কমপিউটর চেক করে নিল। সারফেস থেকে তলায় নামতে তিন মিনিট লেগেছে, মিনিট পাঁচেক ব্যয় হয়েছে মিগের ককপিটে। খুব বেশি হলে আর দশ মিনিট সাগরের তলায় থাকতে পারবে। বেন্ড-এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে হলে থেমে থেমে সারফেসের দিকে উঠতে হবে ওকে, পঁয়তাল্লিশ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা সময় নিয়ে। নটিংহাম কাত হয়ে থাকায় ভেতরে ঢোকার পর দিশেহারা বোধ করল রানা। চেয়ার-টেবিলগুলো পাশের দেয়ালে গাঁথা। দেয়ালটাই এখন মেঝে। কয়েকটা দরজাকে পাশ কাটাল ও। কি ধরনের ক্ষতি হয়েছে দেখার পর একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল, এ-সবের জন্যে কোন টর্পেডো দায়ী নয়। টর্পেডো বাঁক ঘোরে না, সিঁড়ি বেয়ে ওঠা-নামাও করে না। করিডরগুলো ক্ষতবিক্ষত, যেন প্রকাণ্ড কোন সামুদ্রিক দানব দাঁত দিয়ে ভেঙেচুরে নিজের পথ করে নিয়েছে, কিংবা কোন ড্রিল মেশিন ক্ষতবিক্ষত করেছে জাহাজটাকে। শুধু তাই নয়, সেটা এমন একটা ড্রিল, যেন তার নিজস্ব চোখ বা বুদ্ধি আছে, জানত কোত্থেকে কোথায় যাচ্ছে।

একটা সিঁড়ি বেয়ে অন্ধকারে ডুব দিল রানা। টর্চের হলদেটে আলো ভৌতিক একটা পরিবেশ তৈরি করল, ছায়াগুলো জ্যান্ত

প্রাণীর মত নড়াচড়া করছে। খাদের কিনারায় থাকায় মাঝে-মধ্যে নিজে থেকেই নড়াচড়া করছে ফ্রিগেট। রানার ভয় হলো, ওর নড়াচড়ায় ভারসাম্য হারিয়ে যেতে পারে, সেক্ষেত্রে ওকে নিয়েই অতল গহ্বরে খসে পড়বে জাহাজটা। লোয়ার ডেকের মেইন করিডর ধরে এগোচ্ছে ও, উদ্দেশ্য মিউনিশন রূমে যাওয়া। ভেতরে ঢোকার আগে বড় একটা ধাতব বাক্স পা দিয়ে ঠেলে সরাতে হলো। দরজাটা ভাঙা, ঢুকতে আর কোন বাধা নেই। কিন্তু পা বাড়াতেই ওর সামনে চলে এল একটা হাত। চমকে উঠে হাতটার কব্জি চেপে ধরল রানা, তারপর মোচড়াতে গিয়ে উপলব্ধি করল হাতটা আসলে মরা এক নাবিকের। লাশটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকল ও।

ভেতরে আরও অনেক লাশ ভাসছে। ঝাঁক ঝাঁক ছোট মাছ খাচ্ছে ওগুলোকে। টর্চটা ঝাঁকাতে ছুটে পালাল তারা। আরেকটা দরজা পেরিয়ে মিউনিশন রূমে ঢুকল রানা, ড্রিল মেশিনের দাগ এখানে এসে থেমে গেছে। টর্চের আলোয় ছ'টা ক্রুজ মিসাইল দেখল রানা। তবে কাছাকাছি প্যাডটা, সাত নম্বর, খালি ক্ল্যাম্পগুলো পরীক্ষা করল রানা, ওয়েল্ডারের টর্চ দিয়ে কাটা হয়েছে ওগুলো। আচ্ছা, তাহলে এই ব্যাপার! এখন আর ব্যাপারটাকে সাধারণ সঙ্কট বলা যাবে না। যে-ই দায়ী হোক, তার হাতে এখন একটা ক্রুজ মিসাইল আছে। রানা যেহেতু এসপিওনাজ এজেন্ট, ওর জানা আছে ব্রিটেনের ফ্রিগেট শ্রেণীর যুদ্ধজাহাজে অন্তত একটা ক্রুজ মিসাইলে নিউক্লিয়ার ওঅরহেড থাকেই।

সাগরের তলায় রানার কাজ শেষ হয়েছে। এখন ওর কাছে

প্রমাণ আছে ডোবার সময় নটিংহাম আসলেই আঞ্চলিক জলসীমার ভেতর ছিল। আরও জানা গেছে কোন চীনা মিগ মিসাইল ছুঁড়ে ফ্রিগেটটাকে ডোবায়নি। টর্চ উঁচু করে কামরাটা থেকে বেরিয়ে আসতেই একটা স্পিয়ার গানের ডগা ঠেকল ওর বুকে, গানের অপরপ্রান্তে রহস্যময় এক ডাইভার। আগন্তুকের এক হাতে স্পিয়ার গান, অপর হাতে টর্চ।

দুই হাত উঁচু করল রানা, বোঝাতে চাইল সে নিরস্ত্র, সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে পিছাতে শুরু করল। রহস্যময় ডাইভার এখনও ওর বুকের দিকে স্পিয়ার গান তাক করে আছে। স্যাঁৎ করে একটা অন্ধকার প্যাসেজে ঢুকে পড়ল রানা, দেয়ালে বসানো পিস্তল-বক্স থেকে ঝট করে একটা গান তুলে নিল হাতে। ডাইভারের দিকে একটা ফ্লেয়ার ফায়ার করল ও। আগন্তুকের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। ঝট করে সামনে এগিয়ে স্পিয়ার গানটা কেড়ে নিল রানা, টান দিয়ে খুলে নিল ফেস মাস্ক।

লীনা ওয়াংকে চিনতে পেরে হাঁ হয়ে গেল রানা। লীনাও কম অবাক হয়নি। ফেস মাস্কটা পরতে সাহায্য করল রানা, তারপর হাত তুলে ওপর দিকটা দেখাল। ইঙ্গিত বুঝতে পেরে মাথা ঝাঁকাল লীনা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সারফেসে পৌঁছুতে হবে ওদেরকে। বরাদ্দ সময় শেষ হয়ে আসছে।

জাহাজ থেকে বেরিয়ে ওপরে ওঠার সময় চল্লিশ ও ত্রিশ ফুটে কয়েক মিনিট করে থামল ওরা। বিশ ফুটে থামল ত্রিশ মিনিট। অবশেষে দু'জন একসঙ্গে পানির ওপর মাথাচাড়া দিল। গরম রোদ লাগল মুখে।

'ব্যাংকিং ব্যবসার এই এক মজা,' বলল রানা। 'যেখানে খুশি

বেড়ানো যায়।’

হেসে উঠে লীনা বলল, ‘তবে খরচের দিকটাও মনে রাখা দরকার। তা না হলে কোম্পানী দেউলিয়া হয়ে যাবে।’ ইঙ্গিতে একটা চাইনীজ জাঙ্ক দেখাল রানাকে, কাছাকাছি ভাসছে। লীনাকে নিতে আসছে ওটা।

জাঙ্কটা সাধারণ একটা চীনা বোট। পোল মাস্ট খুব উঁচু। ডেকের কিনারায় একজন চীনাকে দেখা গেল, লীনার উদ্দেশে হাত নাড়ছে। রানা ভাবল, লীনার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় ভালই হলো। রবার্ট মিথ কথা দিয়েছিল ওকে পানি থেকে তুলে নেবে ভিয়েৎনামী একটা জেলে নৌকা, মাঝি লোকটা সিআইএ-র কাজ করে। কিন্তু আশপাশে আর কোন বোটই দেখা যাচ্ছে না। মিথ হয়তো মাঝির সঙ্গে সময়মত যোগাযোগ করতে পারেনি।

জাঙ্কটা কাছে চলে এল। চীনা লোকটা একটা লাইন ছুঁড়ে দিল পানিতে। লীনার সঙ্গে চীনা ভাষায় দু’একটা কথা বলল সে। তারপর হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত, লোকটার বুক বিস্ফোরিত হলো, চারদিকে তীরবেগে ছুটে গেল রক্ত আর ছিন্নভিন্ন মাংস। তার পিঠ দিয়ে ঢুকে বুক চিরে বেরিয়ে এসেছে একটা হার্পুন। চেহারায় অবিশ্বাস, ডেকের কিনারা থেকে ঢলে পড়ল লোকটা, পানিতে পড়ার আগেই মারা গেছে।

লোকটার পিছনে ছিল মেনাচিম, হাতে স্পিয়ার গান নিয়ে ডেকের কিনারায় এসে দাঁড়াল সে।

হাতকড়া পরাবার আগে ওদেরকে শুকনো কাপড় পরার অনুমতি দেয়া হলো। লীনার কাপড়চোপড় বোটেই ছিল- কালো ট্রাউজার,

সাদা টি-শার্ট, লাল জ্যাকেট ও টেনিস শূ। রানাকে পরতে হলো নিহত এক নাবিকের নীল লিনেন শার্ট, কালো ট্রাউজার, টেনিস শূ-জুতো জোড়া সাইজে একটু ছোট হলো।

'আমরা এখন ভ্রমণে বেরুব,' হাসি হাসি মুখ করে বলল মেনাচিম।

'কোথায় যাচ্ছি?' জানতে চাইল রানা।

'মি. ফাউলার আপনার সঙ্গে গল্প করতে চেয়েছেন। আমরা জাকার্তা হেডকোয়ার্টারে যাচ্ছি।'

'এই বোট নিয়ে ইন্দোনেশিয়ায় যাব?'

'কথা না বলে চুপচাপ বসে থাকুন!' ধমক দিল মেনাচিম, স্পিয়ার গানটা তাক করল রানার দিকে। বোটের ডেকে বসে পড়ল ওরা। জার্মান স্যাডিস্টের পেশীতে ঢিল পড়ল। 'একটা হেলিকপ্টার আসছে।' ঘুরে দু'জন লোককে কাছে ডাকল সে, প্রত্যেকের হাতে একটা করে অটোমেটিক। কি নিয়ে আলাপ করছে বোঝা গেল না, তবে তিনজনই গলা ছেড়ে হেসে উঠল।

বোঝাই যায়, বোটের চীনা ক্রুদের সবাইকে খুন করেছে ওরা, লাশগুলো ফেলে দিয়েছে সাগরে। সংখ্যায় ওরা মাত্র তিনজন, কাবু করা কি একেবারেই অসম্ভব? চিন্তা করছে রানা। না, পালানোর চেয়ে ফাউলারের মুখোমুখি হওয়াটাই বেশি দরকার। লোকটার উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যাবে।

'নটিংহামে তো আপনিও ঢুকেছিলেন,' খানিক পর লীনাকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'কি দেখলেন?'

'একটা মিসাইল নেই। গর্তগুলো দেখে মনে হলো টর্পেডোর কাজ...'

‘টর্পেডোই যদি হবে, এত সব ভাঙচুর করার পরও বিস্ফোরিত হলো না কেন? তাছাড়া, টর্পেডো কি বাঁক ঘুরতে পারে?’

ভুরু কুঁচকে চিন্তা করছে লীনা। ‘তাই তো!’

‘কোন কথা নয়, একদম চুপ!’ ধমক দিল মেনাচিম।

বোট ছুটছে, সময় বয়ে যাচ্ছে। বিকেল হতে আর বেশি দেরি নেই। জার্মান ভাষায় নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে ওরা, জানা গেল যুদ্ধ জাহাজের বহরকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে ব্রিটেনকে বারো ঘণ্টা সময় দিয়েছে চীন।

আট

মুক্তবাজার অর্থনীতি গ্রহণ করার পর ইন্দোনেশিয়া সরকার বিদেশী পুঁজি আকৃষ্ট করার জন্যে আন্তর্জাতিক উদ্যোক্তাদের নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধে দেয়ার কথা ঘোষণা করে, সেটা কাজে লাগিয়ে হঙকঙ থেকে জাকার্তায় উঠে এসেছে এফএমজিএন। শুধু যে জাকার্তায় অফিস বিল্ডিং তৈরি করেছে তারা, তা নয়, ইন্দোনেশিয়ার কয়েক হাজার ছোট-বড় দ্বীপ থেকে বাছাই করে বেশ কয়েকটা দ্বীপও তারা লীজ নিয়েছে।

জাকার্তার সুহার্তো এভিনিউয়ে পঞ্চাশতলা একটা বিল্ডিঙে এফএমজিএন-এর হেডকোয়ার্টার, বিল্ডিঙটা এখনও পুরোপুরি তৈরি হয়নি, দু'পাশে বাঁশ দিয়ে বানানো বিশাল আকারের মাচা ঝুলছে। তবে বিল্ডিঙের সামনের দিকটা কাঁচ দিয়ে মোড়ার কাজ শেষ হয়েছে। তিন থেকে পাঁচতলা পর্যন্ত লম্বা প্রকাণ্ড একটা ব্যানার ঝুলছে ওখানে, তাতে ম্যাডডক ফাউলারের ছবি শোভা পাচ্ছে।

বিল্ডিঙের ছাদে ল্যান্ড করল ওদের হেলিকপ্টার। হাতে এখনও

হাতকড়া, 'কপ্টার থেকে নেমে একটা এলিভেটরে চড়ল রানা ও লীনা, সামনে আর পিছনে পাহারায় থাকল সশস্ত্র গার্ড।

দশতলায় নামল ওরা। করিডর ধরে হাঁটার সময় সাফারি পরা এক চীনা ভদ্রলোককে পাশ কাটাল, তাঁকে দেখে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকল লীনা। জেনারেল ফুয়াং চুকে দেখেই চিনতে পেরেছে সে। আচ্ছা, চীন থেকে পালিয়ে এসে জেনারেল তাহলে ম্যাডক ফাউলারের হেডকোয়ার্টারে লুকিয়ে আছেন! কিন্তু না, এই মুহূর্তে তার কিছু করার নেই। জেনারেল ফুয়াং চু হাতকড়া পরা রানা বা লীনার দিকে ভুলেও একবার তাকালেন না, করিডর ধরে সোজা হেঁটে চলে গেলেন।

একটা বাঁক ঘুরল ওরা। আরেকজন চীনাকে দেখা গেল, পোশাক-আশাক আর ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হয় মাইকেল জ্যাকসনকে নকল করছে।

ফাউলারের অফিসের সামনে দাঁড় করানো হলো ওদেরকে। দু'জন গার্ডকে মেনাচিম বলল, 'এঁদের ওপর নজর রাখো।' দরজা খুলে অফিসের ভেতর ঢুকল সে।

'সাফারি পরা ভদ্রলোককে আপনি বোধহয় চিনতে পেরেছেন,' ফিসফিস করল রানা। 'কে ভদ্রলোক?'

'ঋণ খেলাপি,' নিচু গলায় বলল লীনা।

দরজা খুলে ভেতরে ঢোকার ইঙ্গিত দিল মেনাচিম। অফিসের ভেতরটা হামবুর্গ নিউজরুমের খুদে সংস্কারণই বলা যায়। আসলে বিলাসবহুল প্রাইভেট নিউজ স্টুডিও। বড় একটা কনফারেন্স টেবিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানচিত্র দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। আরেকটা ম্যাপে বঙ্গোপসাগর সহ বাংলাদেশকে দেখানো হয়েছে।

প্রথম ম্যাপে খুদে মডেলের সাহায্যে চীন আর ব্রিটেনের যুদ্ধজাহাজগুলোর পজিশন বোঝানো হয়েছে। সুমাত্রা থেকে একশো বিশ মাইল দূরে, ছোট একটা ইন্দোনেশিয়ান দ্বীপ দেখা যাচ্ছে, দ্বীপের গায়ে সোনালি টিক চিহ্ন। রানার ভুরু কুঁচকে উঠল বাংলাদেশের ম্যাপে একটা লাল ক্রস চিহ্ন দেখে। চিহ্নটা ঢাকাকে কলঙ্কিত করছে।

অফিসের আরেক প্রান্তে রয়েছে ফাউলার, মনিটরের স্ক্রীনে চোখ। একটা ডেস্কের সামনে বসে রয়েছে খায়রুল কবির, একটা পিসি নিয়ে নিজের কাজে ব্যস্ত।

এগিয়ে গিয়ে ফাউলারের কানে ফিসফিস করল মেনাচিম।

'সত্যি?' ফাউলার বলল। 'ঠিক আছে, দেখা যাবে।'

সরে এল মেনাচিম, চোখ নামিয়ে মেঝের দিকে তাকাল। ঘুরে রানা আর লীনার দিকে ফিরল ফাউলার।

'এই যে, মি. রানা,' বলল সে, 'মাত্র গতকাল আমার স্ত্রীকে আপনার বিছানায় মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। আর দুনিয়ার অর্ধেকটা ঘুরে আজই আপনি চলে এসেছেন আমার অফিসে মরার জন্যে? কী চমৎকার, তাই না? আপনার আসল পরিচয় আগে যদি জানতাম, আপনার ব্যবস্থা অন্যভাবে করা হত।'

চট করে একবার রানার দিকে তাকাল লীনা। সুদর্শন বাঙালী ভদ্রলোক সাধারণ কেউ নয়, এটুকু তার জানা আছে, কিন্তু আসল পরিচয় সম্পর্কে কোন ধারণা নেই।

লীনার দৃষ্টি লক্ষ করে ফাউলার বলল, 'এ-ও কি সম্ভব যে পরস্পরের আসল পরিচয় এখনও আপনারা জানেন না? মাসুদ রানা, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের অন্যতম এজেন্ট, শোনা

যায়, এসপিওনাজ জগতে কিংবদন্তীর নায়ক, আন্তর্জাতিক অপরাধী মহলের পরম শত্রু বা ত্রাস। উনি অন্য দেশের হয়েও ভাড়া খাটেন, এই এখন যেমন ব্রিটেনের হয়ে খাটছেন। আর পরমাসুন্দরী লীনা ওয়াং, পিপল'স এক্সটার্নাল ইন্টেলিজেন্স ফোর্সের অন্যতম স্পাই, জাল ফেলে দলছুট গুপ্তচর ধরায় এক্সপার্ট, বোধহয় সেজন্যেই তাঁকে বিষাক্ত মাকড়সা বলা হয়। আপনারা কি খবরের কাগজ পড়েছেন? জানেন আপনারা যে দুই দেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন তারা পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে?'

স্পরস্পরকে অবশ্যই চিনি আমরা,' বলল রানা। 'দু'জন একসঙ্গেই কাজ করছি। আপনার প্ল্যান সম্পর্কে সবই আমরা জানি। দুই হেডকোয়ার্টারেই রিপোর্ট পাঠিয়েছি। কালকের হেডলাইন আপনি লিখবেন না। বরং আপনাকে নিয়েই ওটা লেখা হবে।'

বুকে হাত দিয়ে ঢলে পড়ার ভঙ্গি করলেন ফাউলার, ব্যথায় বিকৃত হয়ে উঠল চেহারা। 'ওহ্ মাই গড! সর্বনাশ হয়ে গেছে! আত্মসমর্পণ না করে উপায় নেই!' মাথার ওপর হাত তুললেন তিনি। তার কৌতুক ধরতে না পেরে খানিক ইতস্তত করল মেনাচিম, তারপর সে-ও হাত তুলল।

বিশুদ্ধ বাংলায় গালি দিল খায়রুল কবির, 'ব্যাটা উজবুক কোথাকার!' তারপর জার্মান ভাষায় বলল, 'হের ফাউলার কৌতুক করছেন, গাধা!'

বিব্রত মেনাচিম কবিরের দিকে চোখ গরম করে তাকাল।

'মেনাচিমের বৈশিষ্ট্য অন্য ক্ষেত্রে, ওকে ছোট করে দেখাটা

ভুল,' বিশ্বস্ত খুনীর পক্ষ নিয়ে বলল ফাউলার। রানা ও লীনার দিকে তাকাল। 'লক্ষ করুন, এর মধ্যে চমক আছে।'

ডেস্ক থেকে রুপোলি ও ধারাল একটা লেটার ওপেনার তুলল ফাউলার। মেনাচিমকে দিল সেটা। স্পায়ে এটা গাঁথো, মেনাচিম।'

লেটার ওপেনার নিয়ে উরুর মাংসে গাঁথল মেনাচিম, যতটা গভীরে সম্ভব, নির্দ্বিধায় ও অনায়াসে। 'এভাবে?' জিজ্ঞেস করল সে, যেন হাত নেড়ে একটা মাছি তাড়াল।

'দেখলেন?' হাসছে ফাউলার। 'মেনাচিমকে স্বাভাবিক বলা যাবে না, তার বৈশিষ্ট্যই হলো সবাই যাতে ব্যথা পায় সে তাতে আনন্দ অনুভব করে। সেজন্যেই ওকে আমি নিখুঁত একটা কিলিং মেশিন বানাতে পেরেছি।' মেনাচিমের দিকে ফিরল। 'ওটা তুমি বের করতে চাও, নাকি রেখে দিতে চাও?'

'রাখার অনুমতি দেবেন,' জিজ্ঞেস করল মেনাচিম, রীতিমত সিরিয়াস, 'আরও কিছুক্ষণ, প্লীজ?'

'এই আপীড়ন মেনাচিমের এক ধরনের মানসিক খোরাক,' বলল ফাউলার। 'দিনে সাতবার নিজেকে এভাবে ক্ষতবিক্ষত করার অনুমতি চায় সে। কিন্তু তা কি...'

'ও কানা হয়ে যাবে,' বিদ্রূপ করল রানা।

'ভেরি ফানি। তবে এর মধ্যে মিস লীনার জন্যে কোন ফান নেই। যৌন উত্তেজনায় খুব কমই কাতর হয় মেনাচিম, কিন্তু যখন হয়...কি বলব, আমার সংগ্রহে যে ভিডিওটেপগুলো আছে দেখলে আপনাদের হার্ট অ্যাটাক হবে।'

'আপনার তাহলে সাবধান হওয়া উচিত,' বলল রানা। 'কানা হয়ে যেতে পারেন।'

ফাউলার গায়ে মাখলেন না। 'সাধারণ নিয়ম ধরে এগোলে, তথ্য আদায়ের জন্যে আপনাদের দু'জনকে মেনাচিমের হাতে তুলে দেয়া উচিত আমার। কিন্তু আপনারা কি জানেন না জানেন তা নিয়ে আমার কোন দুশ্চিন্তা নেই। কাজেই আপনাদের ওপর মেনাচিম টরচার করবে স্রেফ মজা পাবার জন্যে। মিস লীনার জন্যে সাংঘাতিক দুঃসংবাদ, কারণ ওঁকে তার খুব পছন্দ হয়েছে।'

'কিন্তু এই না আপনি বললেন মেনাচিম ব্যথা পেতে ভালবাসে?'

'বাসে, তবে দিতে ভালবাসে আরও বেশি- দশগুণ।'

রানা বলল, 'আমরা জানি নটিংহামকে বিপথে সরিয়ে নেয়ার পর ওটা থেকে ওঅরহেড ফিট করা একটা ক্রুজ মিসাইল চুরি করেছেন আপনারা।'

'তাই নাকি?' জিজ্ঞেস করল খায়রুল কবির। 'কিভাবে?'

'তোমরা তোমাদের স্যাটেলাইট ব্যবহার করে ব্রিটিশ ফ্রিগেটকে চীন উপকূলে সরিয়ে নিয়ে গেছ, চুরি করা একটা অ্যাকসেস ডিভাইসের সাহায্যে...'

রানার কথা শেষ হলো না, শুরু করল লীনা, '...আর ইনভেস্টিগেট করতে আসা দুটো চীন মিগকে আপনারা গুলি করে নামিয়েছেন, উদ্দেশ্য ছিল চীন আর ব্রিটেনের মধ্যে একটা...'

'আমরা আরও জানি,' বলল রানা, 'চীন হুমকি দিয়েছে আজ মাঝরাতের মধ্যে ব্রিটিশ জাহাজ প্রত্যাহার করা না হলে তারা ওগুলোর ওপর হামলা চালাবে। চীন যদি হামলা না-ও করে, আপনারা চুরি করা ক্রুজ মিসাইলটা বেজিঙে ফেলবেন, চীন যাতে

লন্ডনে হামলা চালায়।'

'ভুল, মি. রানা, ভুল,' সহাস্যে বলল ফাউলার। 'আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ছেন আপনারা, তবে ভুলটা করছেন অন্যখানে। ওই রকম একটা প্ল্যান আমরা করেছিলাম ঠিকই, কিন্তু সেটা বাতিল করা হয়েছে। এখন আমরা নিউক্লিয়ার ওঅরহেডটাকে ঢাকায় পাঠাব। মাঝরাত পর্যন্ত অপেক্ষাও করব না, তার আগেই...'

চমকে উঠল রানা, তবে সন্দেহ হলো ভুল শুনেছে কিনা। 'কি বললেন?'

স্প্ল্যানটা বদল করা হয়েছে, মি. রানা,' বললেন ফাউলার। 'বোমাটা ঢাকাতেই আমরা ফেলতে যাচ্ছি। তবে বলতে পারবেন না যে অকারণে। প্রথমে আপনি আমার এত সাধের রাজকীয় পার্টিটা পণ্ড করে দিয়েছেন। তারপর ভাগিয়ে নিয়ে গেছেন আমার স্ত্রীকে। সবশেষে আমার কয়েকজন বিশ্বস্ত বডিগার্ডকে খুন করেছেন, আহত করেছেন আরও বেশি লোককে। থামুন, আমার কথা শেষ হয়নি। একা শুধু আপনাকে আমি শত্রু হিসেবে দেখছি, তা নয়। আমার অনুগত বন্ধু খায়রুল কবির আমাকে জানিয়েছেন, আপনাদের বিসিআই নাকি দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন এই নীতিটাকে আদর্শ হিসেবে নিয়েছে। এখন কথা হলো, জেনারেল ফুয়াং চুর কাছ থেকে যে টেকনলজি পেয়েছি আমরা তার সাহায্যে আমাদের প্লেন বা জাহাজ পৃথিবীর কোন রেডারে ধরা পড়বে না। আর টেকনো-টেরোরিস্ট মি. কবিরের কাছ থেকে পেয়েছি একটা প্রোবিং মেশিন সীঈল ও জিপিএস। এগুলোর সাহায্যে গভীর সমুদ্রের যে-কোন জাহাজকে আমরা কোর্স থেকে দূরে নিজেদের সুবিধেমত জায়গায় সরিয়ে আনতে পারব। এর তাৎপর্য কি বুঝতে

পারছেন তো?

‘তাৎপর্য হলো, যে-কোন জাহাজ ডুবিয়ে দিয়ে সমস্ত কার্গো সরিয়ে আনতে পারব আমরা। এত লাভজনক ব্যবসা দুনিয়ায় আর দ্বিতীয়টি নেই। কিন্তু যেহেতু বিসিআই এ-সব বিষয়ে অনেক কিছু জেনে ফেলেছে, ব্যবসাটা আমরা নির্বিঘ্নে করতে পারব না। সেজন্যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি বাংলাদেশকে কেটে সাইজ করা হবে।’

রানা কিছু বলার আগেই রিভলভিং চেয়ারটা ঘোরাল ফাউলার, প্যানেলের একটা বোতামে চাপ দিল। মনিটরে খবর পাঠিকাকে দেখা গেল, খবর পড়ছে, ‘…আজ রাত ন’টার দিকে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার নিরীহ নাগরিকদের ওপর খোদার গজব নেমে এসেছে। নিক্ষেপের উৎস সম্পর্কে কেউ কিছু বলতে পারছে না, তবে নিশ্চিতভাবে জানা গেছে একটা ব্রিটিশ ক্রুজ মিসাইল নিউক্লিয়ার ওঅরহেড সহ আঘাত হেনেছে ঢাকার জিরোপয়েন্টে। সেক্রেটারিয়েট, হাইকোর্ট, প্রথম স্টেডিয়াম, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, গোটা ক্যাম্পাস, পাঁচটা হাসপাতাল, কমলাপুর রেলস্টেশন, সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল এবং শহরের সমস্ত উঁচু বিল্ডিঙ মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। বলাই বাহুল্য গণভবন আর বঙ্গভবনও এই তালিকায় আছে। ঢাকার বাইরে থেকে আমাদের রিপোর্টাররা জানিয়েছেন, প্রথম দশ সেকেন্ডের মধ্যে রাজধানীর পঞ্চাশ লাখ লোক শুধু শক ওয়েভেই মারা গেছে। ত্রিশ মাইল পরিধির মধ্যে আগুন ছাড়া আর কিছুই নাকি দেখা যাচ্ছে না। ভারত, পাকিস্তান, নেপাল ও সিকিমে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদ বিশেষ অধিবেশন ডেকে…’

‘এ-সব আপনার মিডিয়ার আগাম খবর,’ ঢোক গিলে বলল

রানা। 'বানানো ও ভুয়া।'

'কিন্তু আপনাকে স্বীকার করতে হবে বর্তমানে আমিই দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ, কারণ বানানো বা ভুয়া খবর বাস্তবে পরিণত করার ক্ষমতা রাখি।'

'সবচেয়ে শক্তিশালী পাগল,' বিড়বিড় করল লীনা।

'যতই শক্তিশালী হন, তারপরও তো আপনি নিজের আসল পরিচয় মুছে ফেলতে পারবেন না,' বলল রানা। 'আপনার মা ছিল বেশ্যা, আপনি একটা বেজন্মা, বড় হয়েছেন নর্দমায়। আপনি সবার উপহাসের পাত্র।'

'ঢাকা যখন শক-ওয়েভে ধ্বংস হয়ে যাবে, তখনও কি আপনি আমাকে উপহাস করবেন, মি. রানা?'

'হ্যাঁ, কারণ তখনও আপনি বেজন্মাই থেকে যাবেন,' বলল রানা, ফাউলারকে খেপিয়ে তোলার চেষ্টায়। 'আচ্ছা, আপনার সঙ্গে খায়রুলের মত ঠাণ্ডা মাথার একটা সাপ রয়েছে, সে-ও বলেনি যে আপনি আসলে মানসিক প্রতিবন্ধী? বলেনি, স্যাডিস্ট মেনাচিমের চেয়েও অধম আপনি?'

মনিবের এই অপমান মেনাচিম সহ্য করতে পারল না। মারমুখো হয়ে সামনে বাড়ল সে, অমনি রানা ও লীনার শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। এক হাতে লীনাকে পেঁচাল রানা, সিকি পাক ঘোরাল, লীনা যাতে হাত লম্বা করে মেনাচিমের ঊরুতে গাঁথা লেটার ওপেনারটা ধরতে পারে। মাংস থেকে ওটা বের করেই কবিরের দিকে লাফ দিল সে, রানাকে টেনে নিচ্ছে। মেনাচিম যে-ই খপ করে ধরতে গেল রানাকে, কবিরের পাঁজরে ব্লেডটা ঢুকিয়ে দিল লীনা।

'না!' গর্জে উঠল ফাউলার। মেনাচিম স্থির হলো, কিন্তু রানার গতি আরও বেড়ে গেল। কাছাকাছি দাঁড়ানো একজন গার্ডের গলা হাত দিয়ে পেঁচিয়ে নিজের বুকে টেনে নিল ও। গার্ডের হাতে বিস্ফোরিত হলো মেশিন গান, কামরার চারদিকে এক পশলা বুলেট বৃষ্টি হলো। ফাউলারকে লক্ষ্য করে ডাইভ দিল মেনাচিম, মনিবকে বাঁচানোর জন্যে নিজেকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করবে, এই সময় কামরার ভেতর হুড়মুড় করে আরও কয়েকজন গার্ড ঢুকে পড়ল। সরাসরি রানাকে লক্ষ্য করে গুলি করল তারা।

'মি. কবিরকে যেন গুলি না লাগে!' চেঁচিয়ে উঠল ফাউলার।

রানা যাকে নিজের সামনে ধরে রেখেছে, গার্ডদের গুলি খেয়ে মারা গেল সে। আরও এক পশলা গুলি রানার পিছনের জানালা ভেঙে ফেলল, চুরমার হয়ে গেল শার্সির সমস্ত কাঁচ, বাইরে দেখা যাচ্ছে আকাশ ছোঁয়া সারি সারি বিল্ডিং। লীনাকে নিয়ে ধীরে ধীরে পিছু হটছে রানা, লীনা রানার পাশেই রয়েছে, কবিরকে এখনও ছাড়েনি, হাতের লেটার ওপেনার এখনও কবিরের পাঁজরে গাঁথা।

'সং সেজে দাঁড়িয়ে থেকো না!' গার্ডদের উদ্দেশে চেঁচাচ্ছে ফাউলার। 'ওদের ধরো!'

চারজন গার্ড ছুটে এল। জানালার কার্নিসে পিঠ ঠেকতে ঘাড় ফিরিয়ে নিচেটা একবার দেখে নিল রানা। তারপর দু'জন মিলে ধাক্কা দিল কবিরকে। ভারী বস্তার মত গার্ডদের ওপর পড়ল কবির। ওই একই সময়ে হাতকড়া পরা দুই এজেন্ট জানালা দিয়ে লাফ দিল নিচে।

সরাসরি দশতলা থেকে নিচের রাস্তায় পড়ার কথা ওদের, তবে আগেই রানা দেখে নিয়েছে মাত্র বিশ ফুট নিচে সবুজ একটা

নেট আছে। নেটের পাশে ঝুলছে প্রকাণ্ড একটা ব্যানার, তাতে ফাউলারের ছবি আঁকা।

‘এখান থেকে নামব কিভাবে?’ জিজ্ঞেস করল লীনা।

লীনার হাত থেকে লেটার ওপেনারটা নিয়ে ব্যানারটা চিরে ফেলল রানা, ফাউলার বিভক্ত হয়ে গেল। ছেঁড়া অংশটুকু বাম হাতে জড়াল রানা, অপর হাতে বুকে টেনে নিল লীনাকে, তারপর লাফ দিল নেট থেকে। ফড় ফড় করে ছিঁড়তে শুরু করল ব্যানার, সেই সঙ্গে ছেঁড়া প্রান্তটা ওদের দু’জনকে নিয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে। তিনতলার একটা মাচায় নিরাপদেই নামল ওরা, সেখান থেকে মই বেয়ে পড়ল রাস্তায়। রাস্তায় প্রচুর লোকজন, ভাঙা জানালা থেকে উঁকি দিয়ে ওদের দু’জনকে দেখতে পেলেও মেনাচিম বা তার গার্ডরা গুলি করতে সাহস পাচ্ছে না।

ফুটপাথ ধরে ছুটছে ওরা, না চাইতেই একটা ট্যাক্সি পাশে এসে দাঁড়াল। ট্যাক্সিতে ওঠার তিন মিনিট পর মাথার ওপর হেলিকপ্টারের আওয়াজ পেল রানা, তবে ধীরে ধীরে দূরে সরে গেল সেটা। সামনে থেকে চীনা ড্রাইভার বলল, ‘সাহায্য করলাম আপনার বান্ধবী আমার স্বদেশী, তাই। তবে বিনা পয়সায় নয়। শহরের ভেতর থাকলে পাঁচশো মার্কিন ডলারের কম নেব না।’

‘আরও একশো ডলার বেশি পাবে,’ বলল রানা। ‘তবে জেনে রাখো আমরা জাকার্তা পুলিসের বন্ধু।’

‘তাহলে মিটারে যা ওঠে তাই দিলেই চলবে।’

‘বকশিশ নেয়ার কোন অপরাধ নেই,’ মন্তব্য করল লীনা।

রানা বলল, ‘লীনা, কথাটা আমি স্বীকার করছি।’

লীনা অবাক। ‘কি কথা?’

‘ফাউলার মিথ্যে বলেনি। আমি সত্যি ব্যাংকার নই। বিসিআই এজেন্ট, তবে বিএসএস-কে সাহায্য করছি।’

‘তাহলে আমাকেও সত্যি কথা বলতে হয়। আমার প্রসঙ্গেও ফাউলার মিথ্যে কথা বলেনি।’

‘দেখা যাচ্ছে দু’জন আমরা একই কাজ করছিলাম।’

‘করছিলাম? এখন আর করছি না?’

রানা বলল, ‘না। কারণ ফাউলার তার প্ল্যান বদল করায় চীন আর ব্রিটেনের মধ্যে যুদ্ধটা বাধছে না। ফাউলারের টার্গেট এখন বাংলাদেশ। এটা এখন আমার একার অ্যাসাইনমেন্ট।’

‘ইচ্ছে হলে আমাকে তুমি পার্টনার হিসেবে নিতে পারো, রানা,’ বলল লীনা, বলার সুরে সামান্য একটু আবেদনও থাকল। ‘তোমার কাছাকাছি থাকতে আমার খারাপ লাগবে না।’

‘সুন্দরী মেয়েদের এ-ধরনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা সত্যি খুব কঠিন,’ হেসে উঠে বলল রানা। ‘তার ওপর তুমি অত্যন্ত যোগ্য স্পাই।’ এক সেকেন্ড চিন্তা করল ও। ‘আন্দাজ করছি, জাকার্তায় তোমার নিরাপদ কমিউনিকেশন লিঙ্ক আছে। ধার দেবে? আমার বসের কাছে জরুরী রিপোর্ট পাঠাতে হবে।’

‘ঠিক আছে, সে-ব্যবস্থা হবে। আর কোন সাহায্য?’

‘ফাউলার যে রেডার টেকনলজি সম্পর্কে বলল, এ-সম্পর্কে কি জানো তুমি?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

কান থেকে একটা ইয়ারিং খুলে রানার হাতকড়ার তালা খোলার কাজে ব্যবহার করল লীনা। ‘দেখো, আমাকে পার্টনার হিসেবে নিলে কত লাভ তোমার।’ ইয়ারিংটা রানার হাতে ধরিয়ে দিল সে।

রানা লীনার হাতকড়া খুলছে, সে বলল, 'রেডার টেকনলজি সম্পর্কে অনেক কথাই জানি আমি। কেন?'

'মিগগুলোকে গুলি করে নামানো হয়েছে, কিন্তু নটিংহাম দায়ী নয়। তুমি তো দেখেছই। বড় একটা ক্রুজ মিসাইল গায়েব হয়ে গেছে, কিন্তু ছোটগুলোর একটাও ফায়ার করা হয়নি।'

'অথচ মিগগুলোর রেডারে ব্রিটিশ ফ্রিগেট ছাড়া আর কিছু ধরা পড়েনি।'

'নটিংহামের রেডারেও তোমাদের মিগ ছাড়া অন্য কিছু ধরা পড়েনি। কিন্তু নটিংহামকে তোমাদের মিগ ডোবায়নি। অবশ্য তোমরা যদি নতুন ধরনের টর্পেডো আবিষ্কার করে থাকো, যে-গুলো বিস্ফোরিত হয় না, তাহলে আলাদা কথা।'

'না, আমাদের হাতে এমন টর্পেডো নেই যেগুলো বাঁক ঘুরতে পারে বা টর্পেডো রূমকে পাশ কাটিয়ে যায়।'

'তারমানে ওখানে অন্য কিছু একটা ছিল, সম্ভবত অদৃশ্য একটা বোট।'

লীনা গম্ভীর হয়ে গেল। 'রাশিয়া এমন ধরনের লো-ইমিশন রেডার ডেভলপ করেছে, যেটা কোন প্লেনে ব্যবহার করলে অন্য কোনও রেডারে ওই প্লেন ধরা পড়বে না। যেভাবেই হোক, ওগুলোর একটা আমরা পেয়ে যাই। কিন্তু সেটা চুরি গেছে-জেনারেল ফুয়াং চুর বেস থেকে। খোঁজ নিতে গিয়ে জানতে পারি ওটা হামবুর্গে আছে। এভাবেই তোমার সঙ্গে আমার দেখা হলো।'

'আমি বাজি ধরে বলতে পারি, রেডারটা খায়রুল কবিরের হাত হয়ে ফাউলারের কাছে পৌঁচেছে,' বলল রানা। 'আর ফাউলার তার নিজের একটা বোটে ওই রেডার ব্যবহার করছে।'

‘আর আমি বাজি ধরছি, এরইমধ্যে ওই বোটে চড়ার জন্যে রওনা হয়ে গেছে ফাউলার।’

রানার চেহারা থমথম করছে। মাথার চুলে আঙুল চালাল, বলল, ‘আমার ধারণা, আজ রাতে সন্ধের পর মাত্র এক ঘণ্টা সময় আছে আমার হাতে, তার আগেই বোটটা ডুবিয়ে দিতে হবে। বোটটা যেহেতু অদৃশ্য, ক্রুজ মিসাইলটা ওতেই আছে।’

‘আমি তোমার সঙ্গে একমত,’ বলল লীনা। ‘তবে ভুলে যেয়ো না, চীন বাংলাদেশের বন্ধু, এই বিপদে তোমার সঙ্গে আমিও আছি। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে, রানা। চলো যাই, আগে আমাদের সেফ হাউসে উঠি।’

জমজমাট একটা বাজারের মুখে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল ওরা।

লীনার সেফ হাউস বান্দুং ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে দেড় মাইল দূরে, একটা রিকশা গ্যারেজের ভেতর। গ্যারেজটায় ঘণ্টা হিসেবে সাইকেলও ভাড়া পাওয়া যায়। একজোড়া সাইকেল নিয়ে পথে নামল ওরা, এ-রাস্তা সে-রাস্তা ঘুরল কিছুক্ষণ। যখন দেখল কেউ ওদের পিছু নেয়নি, আবার ফিরে এল গ্যারেজে। ভেতরের একটা দরজা খুলে সেফ হাউসে ঢুকল লীনা, রানা তাকে অনুসরণ করল। সেফ হাউস মানে বড় একটা কামরা। ভেতরে কমপিউটর, মনিটর, একাধিক টেলিফোন ও ভিডিও ক্যামেরা আছে। অস্ত্র ও রসদ বোঝাই একটা টেবিল ও কেবিনেটও দেখা গেল।

জাকার্তায় বাংলাদেশ সরকারের সব ক’টা অফিস বা রানা এজেন্সির শাখায় নজর রাখার ব্যবস্থা করবে ফাউলার, এটা ধরে নিয়ে লীনার সেফ হাউস থেকে ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ করাটাই

নিরাপদ বলে মনে করছে রানা। লীনা ওকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলল, ফোনটা একশো ভাগ নিরাপদ।

ঢাকা হেডকোয়ার্টারে ফোন করে অ্যাসিস্ট্যান্ট চীফ (অপারেশনালস) সোহেল আহমেদকে পেল রানা। পরস্পরের প্রাণপ্রিয় বন্ধু ওরা, তবে দু'জনের কেউই আজ কৌতুক বা হালকা রসিকতার ধার দিয়েও গেল না। রানার রিপোর্ট শুনে পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পারল সোহেল, মুহূর্তমাত্র দেরি না করে মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের লাইন পাইয়ে দিল ওকে। বস্ ও রানার আলোচনার পর কি সিদ্ধান্ত হয় তার জন্যে অপেক্ষায় না থেকে ঢাকায় উপস্থিত সব ক'জন এজেন্টকে ডেকে পাঠাল অফিসে, যারা ছুটিতে আছে তাদের ছুটি বাতিল করল, তারপর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ফোন করে অনুরোধ করল পুলিস, বিডিআর আর সামরিক বাহিনীর প্রধানদের নিয়ে এখুনি যেন একটা জরুরী মীটিং ডাকা হয়। সবশেষে প্রধানমন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট ও প্রধান বিরোধী দলীয় নেত্রী কে কোথায় আছেন জেনে রাখল। প্রয়োজনে ওঁদের সঙ্গে বিসিআই চীফ স্বয়ং কথা বলবেন।

টেলিফোনে রাহাত খানের সঙ্গে একমত হলো রানা, মাত্র কয়েক ঘণ্টার নোটিশে ঢাকাবাসীকে শহর ত্যাগ করতে বলা হলে যে আতঙ্ক আর উন্মত্ততা দেখা দেবে তাতে হাজার হাজার মানুষ মারা যাবার আশঙ্কা আছে। ব্যস্ততার দরুন শুধু যে দুর্ঘটনা ঘটবে, তা নয়, এক শ্রেণীর সমাজবিরোধী লোক লুঠপাট আর ডাকাতিতেও মেতে উঠবে। তাছাড়া, আশি লাখ থেকে এক কোটি মানুষ ঢাকার বাইরে আশ্রয়ই বা নেবে কোথায়? আবার কাউকে কিছু না জানালেও পাইকারী হত্যাকাণ্ডের দায়-দায়িত্ব বর্তাবে

বিসিআই-এর উপর। সব দিক বিবেচনা করে রাহাত খান বললেন, সিদ্ধান্তটা রাজনীতিকদের ওপর ছেড়ে দেয়াই ভাল।

'তবে,' মূল সঙ্কট প্রসঙ্গে রানাকে তিনি নির্দেশ দিলেন, 'হাতে যখন এখনও কয়েক ঘণ্টা সময় আছে, যা করার একাই তোমাকে করতে হবে। আমি বলতে চাইছি, জাকার্তায় যেহেতু আমাদের আর কোন দক্ষ এজেন্ট নেই, যেভাবে পারো ওঅরহেড মিসাইল যাতে ওরা ছুঁড়তে না পারে সেটা নিশ্চিত করা তোমার দায়িত্ব। এক্ষেত্রে তোমার ব্যর্থতা আমাদের সর্বনাশ ঘটাবে।'

রানা চুপ করে থাকল, উপলব্ধি করল ওর দীর্ঘ কর্মজীবনে এত কঠিন ভাষা আগে কখনও ব্যবহার করেননি বস্।

'আমার কথা স্পষ্ট তো, এমআর নাইন?' কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করলেন রাহাত খান।

রানা বলল, 'আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব, স্যার।'

'সাধ্যমত চেষ্টা করা যথেষ্ট নয়। আমি তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি, লোকজনসহ ঢাকার চেয়ে তোমার প্রাণের মূল্য কিছুই নয়।'

'জ্বী-স্যার,' বলল রানা। 'আমি তা জানি।'

'খুশি হলাম। এবার দেখা যাক, বাইরে থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যায় কিনা। তোমার কোন পরামর্শ আছে?'

'স্যার,' বলল রানা, 'চীনা উপকূলে ব্রিটিশ আর চীনের যুদ্ধ জাহাজগুলো প্রায় মুখোমুখি অবস্থায় রয়েছে। আপনি ওদেরকে আসল পরিস্থিতি সম্পর্কে জানালে ওদের মধ্যে যে ভুল বোঝাবুঝি চলছে তার অবসান ঘটবে। তারপর আপনি ওদের সাহায্যও চাইতে পারবেন। ওদেরকে বলতে হবে ওরা যেন অ্যালার্ট থাকে। ধারণা করছি, ইন্দোনেশিয়ার পশ্চিমের কোন দ্বীপ থেকে

মিসাইলটা ছোঁড়া হবে। রয়্যাল নেভীর যুদ্ধজাহাজে সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল থাকার কথা। ফাউলারের ছোঁড়া মিসাইল ট্রেস করা সম্ভব হলে মাঝ আকাশে ওটাকে বাধা দেয়া অসম্ভব নয়।'

'ঠিক আছে, বুঝতে পারছি। মারভিন লংফেলোর মাধ্যমে ব্রিটিশ নেভীর সঙ্গে কথা বলছি আমি। বেইজিংকেও সতর্ক করে দিচ্ছি। কথা বলে আর সময় নষ্ট করব না। তোমার যা করার করো তুমি, কয়েকটা টেলিফোন সেরে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছি আমি। গুড লাক, মাই বয়।'

ক্রেডলে রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা। লীনা বলল, 'ইন্দোনেশিয়ার চারধারে মোট ছ'টা দ্বীপ লীজ নিয়েছে ফাউলার। তার মধ্যে কোনটায় তার অদৃশ্য বোট আছে জানার উপায় কি?' এরইমধ্যে সে বেইজিঙে, তার বসকে রিপোর্ট করেছে।

'ইন্দোনেশিয়ার উত্তর-পশ্চিমে যদি কোন দ্বীপ লীজ নিয়ে থাকে, বেশিরভাগ সম্ভাবনা ওখান থেকেই মিসাইলটা ছোঁড়া হবে,' বলল রানা। 'সরাসরি বাংলাদেশকে টার্গেট হিসেবে পাবার জন্যে।'

'তাহলে দেখতে হয় ওদিকে ফাউলারের কোন দ্বীপ আছে কিনা।' একটা কমপিউটর টার্মিনালের সামনে বসল লীনা। 'আমাকে মন দিয়ে কাজ করতে দাও। এই ফাঁকে আমাদের কি কি লাগবে বেছে বের করো তুমি।'

চোপসানো একটা জোডিয়াক বোট, ডাইভ ইকুইপমেন্ট, একজোড়া .৩৮ অটোমেটিক পিস্তল, অ্যামিউনিশন, ম্যাগনেটিক লিমপেট মাইন ইত্যাদি বাছাই করল রানা। ওগুলো দু'ভাগে ভাগ করল, একটা লীনার জন্যে, আরেকটা নিজের জন্যে।

'সুমাত্রার উত্তর-পশ্চিমে ফাউলার যে দ্বীপটা লীজ নিয়েছে

সেটার নাম লীলাবতী। ওটা মাত্রা বে-তে।'

'উপকূল থেকে কত মাইল দূরে?' জানতে চাইল রানা।

'একশো বিশ মাইল,' মনিটরে চোখ রেখে বলল লীনা।

'এবার তাহলে চেক করে দেখো, লীলাবতীর কাছাকাছি অস্বাভাবিক কোন ঘটনার রেকর্ড পাওয়া যায় কিনা। সলিল সমাধির ঘটনা, জেলে নৌকার অ্যাক্সিডেন্ট ইত্যাদি।'

কিছুক্ষণ পর মনিটরে সারি সারি চীনা হরফ ফুটল। 'শোনো, রানা, ইন্টারেস্টিং তথ্য। ওদিকটায় চারটে বোট নিখোঁজ হয়েছে, আর জেলে নৌকা ডুবেছে তিনটে, কিন্তু কোন কারণ জানা যায়নি। আমার তো বিশ্বাস, অদৃশ্য বোটটা লীলাবতী বা আশপাশের কোন দ্বীপেই রাখা হয়।'

কামরার ভেতর অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করল রানা, জানে রাহাত খান এই মুহূর্তে অত্যন্ত ব্যস্ত, ফোনে তাঁকে পাওয়া যাবে না। আধ ঘণ্টা পর নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না, ঢাকার নম্বরে ডায়াল করল আবার। বিসিআই হেডকোয়ার্টারে রাহাত খান নেই, প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে তিন বাহিনী প্রধানের সঙ্গে মীটিঙে বসেছেন তিনি। মীটিংটা কোথায় বসেছে তা জানা না গেলেও, রাহাত খানের সঙ্গে রানার যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয়া হলো। নতুন তথ্যটা বসকে জানাল রানা, ওর ধারণা মাত্রা উপকূল থেকে একশো বিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমের দ্বীপ লীলাবতী বা ওটার আশপাশের কোন দ্বীপ থেকে ক্রুজ মিসাইলটা ছোঁড়া হবে।

'ভেরি গুড, এই তথ্যটাই আমরা জানতে চাইছিলাম,' বস্ ওকে বললেন। 'তোমাকেও কয়েকটা তথ্য দিই, এমআর নাইন। আমাদের একটা সুসজ্জিত গানবোট শুভেচ্ছা সফরে শ্রীলংকায়

ছিল, এরই মধ্যে সেটা ইন্দোনেশিয়ার দিকে রওনা হয়ে গেছে। সুখবর হলো, আমাদের গানবোটে সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল আছে।'

'খানিকটা স্বস্তিবোধ করছি, স্যার।'

'বেইজিং আর লন্ডনের সঙ্গেও কথা বলেছি আমরা,' বললেন রাহাত খান। 'ম্যাডক ফাউলারের কারসাজি ওরাও ধরতে পেরেছে, ফলে দুই দেশের মধ্যে এখন আর কোন ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার নেই। তবে ওদের যে জাহাজ বহর মুখোমুখি ছিল সেগুলো আমাদের কোন সাহায্যে আসবে না, দূরত্ব অনেক বেশি হয়ে যায়। তবে আরও একটা ভাল খবর হলো, ভারত মহাসাগরে ব্রিটেনের একটা ফ্রিগেট, এইচএমএস নরফোক রুটিন টহলে ছিল, অনুরোধ করায় সেটাও ইন্দোনেশিয়ার দিকে রওনা হয়ে গেছে।'

'স্যার, ঢাকা সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত হলো?'

'তুমি তোমার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকো,' কঠিন সুরে বললেন রাহাত খান। 'এদিকে কি করা হবে আমরা দেখব। রিপোর্ট করার দরকার ছিল, করেছ। এবার নিজের কাজে বেরিয়ে পড়ো।'

'ইয়েস, স্যার!'

ম্যাডক ফাউলার, খায়রুল কবির আর ডিক মেনাচিম সী ঈলের ভেতর দাঁড়িয়ে রওনা হবার প্রস্তুতি তদারক করছে। রেডারের চোখে অদৃশ্য এই বোট কবিরের অধীনে ফাউলারের কারিগররা তৈরি করতে সময় নিয়েছে দু'বছর। উপকূল থেকে একশো মাইল দূরে একটা পাথুরে দ্বীপের গুহার ভেতর লুকানো রয়েছে ওটা।

মাত্র কয়েক মিনিট আগে ব্যক্তিগত সী প্লেন নিয়ে এখানে

পৌঁছেছে ফাউলার। জাকার্তা হেডকোয়ার্টার থেকে রানা ও লীনা পালাবার পর মিডিয়া সম্রাট বুঝতে পারে তার হাতে নষ্ট করার মত সময় নেই। চীন আর বাংলাদেশী এজেন্ট দু'জন কি করতে পারে তা সে চাক্ষুষ করেছে, কাজেই আগে থেকে বলা মুশকিল আবার তারা কখন বা কোথায় মাথাচাড়া দেবে। অনেক গোপন তথ্যই জেনে ফেলেছে ওরা। তবে সে ভয় পাচ্ছে না। প্ল্যান অনুসারে অপারেশনটা শেষ করা যাবে, এ বিশ্বাস তার আছে। তবুও রানা ও লীনা বাধা সৃষ্টি করতে পারে, এই আশঙ্কা টেনশনে ফেলে দিয়েছে তাকে। বার বার হাত তুলে চোয়ালের পেশী ডলছে। ডোজ বেশি হয়ে যাচ্ছে, তবু আরও দুটো ট্যাবলেট খেতে হলো।

'মি. কবির,' বলল সে, 'আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দুটো জিনিস প্রমাণ হয়ে যাবে- এক, সত্যি আপনি বিরল প্রতিভা কিনা; দুই, আমার প্রতি আপনার আনুগত্য নির্ভেজাল কিনা।'

হেসে উঠল কবির। 'আগেই জানিয়েছি- ঢাকা, বিসিআই বা মাসুদ রানা ধ্বংস হয়ে গেলে আমি কাঁদব না। তবে কেউ যদি আমার আনুগত্য পরীক্ষা করতে চায়, আমি প্রতিবাদ করব। কারণ, আমি আমার বাবার মতই স্বাধীনচেতা, আমাদের বংশে কারও বশ্যতা স্বীকার করা একেবারেই নেই। আপনি যদি আমাকে সম-মর্যাদায় বন্ধু হিসেবে চান, আমি রাজি।'

'ঠিক আছে, ভুলটা শুধরে নিচ্ছি,' বলল ফাউলার। 'এটাকে তাহলে আমি বন্ধুত্বের পরীক্ষা হিসেবেই দেখব।'

'আর যদি প্রতিভার কথা বলেন,' গর্বের সুরে বলল কবির, 'আমি মারা যাবার পর ওরা আমার মগজ নিশ্চয়ই কোন মিউজিয়ামে সংরক্ষণ করবে, এ-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।'

'তবে সেটা বাংলাদেশী কোন মিউজিয়াম হবে না,' মন্তব্য করল ফাউলার। সী ঈলের ক্যাপটেনের দিকে ফিরল সে। 'তাড়াতাড়ি করুন, সূর্য ডুবতে আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি।'

'সময় মতই প্রস্তুতি শেষ হবে,' আশ্বস্ত করল ক্যাপটেন।

হাতে মেশিন গান নিয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে মেনাচিম। তার দিকে ফিরল ফাউলার। 'বোকার মত ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছ তুমি? রানা সম্পর্কে কিছু জানতে পারলে?'

'না, বস্। আমরা যতটুকু জানি, এখনও সে জাকার্তায় আছে। দুঃখিত। আপনি চান আবার ওখানে আমাদের লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ করি? মাত্র কয়েক মিনিট আগে রিপোর্ট করেছে ওরা।'

'তুমি আমাকে হতাশ করলে, ডিক,' ফাউলার তিক্ত সুরে বলল। 'ভেবেছিলাম ধরতে পারলে চীনা মেয়েটাকে তোমার হাতে তুলে দেব, কিন্তু এখন আর সে-কথা ভাবছি না...'

'বস্, প্লীজ, এভাবে আমাকে বঞ্চিত করবেন না! অন্তত আরেকটা সুযোগ দিন আমাকে...'

কবির বিড়বিড় করল, 'ধিক, মেনাচিম!'

'খুশি হই ওদেরকে যদি আর দেখতে না পাই। তবে ওরা যদি ধরা পড়ে, আর কৃতিত্বটা যদি তোমার হয়, তাহলে হয়তো উপহার হিসেবে মেয়েটাকে তুমি পেলেও পেতে পারো,' বলল ফাউলার।

'আপনি শুধু অপেক্ষা করুন, বস্। ওদের চেহারা অবশ্যই আবার দেখা যাবে। আর ধরাও পড়বে আমার হাতে।'

'কিন্তু সাবধান, ডিক! এবার কিন্তু তোমার ব্যর্থতা আমি সহ্য করব না।'

মেনাচিম হাসছে। রক্তারক্তি কাণ্ড পছন্দ করে সে, মৃত্যু তাকে

আনন্দ দেয়, কিছু ধ্বংস করতে পারলে উল্লাস অনুভব করে। আজ রাতে এ-সবই ব্যাপক হারে ঘটবে বলে আশা করা যায়। বহু লোক মারা যাবে, বিস্ফোরিত হবে অসংখ্য জাহাজ। শোনা যাচ্ছে এক কোটি লোকবসতি সহ গোটা একটা শহর নাকি ধুলোর সঙ্গে মিশে যাবে। হিরোশিমা-নাগাসাকির পর এত বড় বিপর্যয় আর নাকি ঘটেনি। রীতিমত একটা ইতিহাস সৃষ্টি হতে যাচ্ছে। সেই ইতিহাসে তার নামও থাকবে।

মেনাচিম হাসছে আপনমনে।

নয়

মাত্রা বে-র বৈশিষ্ট্য হলো ওখানকার পানি শান্ত, রঙটা স্বচ্ছ পান্না সবুজ, চারদিকে ছড়িয়ে আছে কয়েকশো লাইম-স্টোন রক আর আইল্যান্ড। বহু দ্বীপেরই দীর্ঘ সৈকত আছে, সাঁতার কাটতে কোন অসুবিধে নেই। কোন কোন দ্বীপের কিনারায় গুহাও আছে।

রানা এজেন্সির সাহায্য নিয়ে রাবার বাগানের শ্রমিক হিসেবে একজোড়া ওঅর্ক পারমিট সংগ্রহ করা রানার জন্যে কোন সমস্যা হলো না, জাকার্তা থেকে সুমাত্রায় এল ওরা ইন্দোনেশিয়ান এয়ারলাইন্সের নিয়মিত ফ্লাইট ধরে। ইতিমধ্যে বিকেল হয়ে গেছে, তাড়াহুড়ো করে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে লীলাবতী শহরে চলে এল। শহরের অর্ধেকটা মেইনল্যান্ডে, বাকি অর্ধেক একশো বিশ মাইল দূরে একটা দ্বীপে। মেইনল্যান্ডের তীরে অসংখ্য বোট দেখা গেল, বেশিরভাগই জেলে নৌকা। মাঝিদের সঙ্গে স্থানীয় ভাষায় কথা বলল লীনা। তার চেহারা শুকিয়ে যাচ্ছে দেখে রানা জানতে চাইল, 'কি ব্যাপার?'

লীনা বলল, 'লীলাবতী ফাউলার লীজ নিয়েছে ঠিকই, কিন্তু

ওখানে অদৃশ্য বোটটা আছে কিনা সন্দেহ। কারণ যা ভেবেছিলাম তা নয়, লীলাবতী নির্জন কোন দ্বীপ নয়। ওখানে প্রচুর ট্যুরিস্ট আসা-যাওয়া করে।'

'তাহলে?'

আরও কয়েকজন জেলে ও মাঝির সঙ্গে কথা বলল লীনা। তারপর রানাকে বলল, 'ওদিকে, ওই দ্বীপটা দেখছ? ওরা বলছে, ওটাকে সবাই এড়িয়ে চলে। যদিও কারণটা বলতে পারছে না। সন্ধ্যার পর ওদিকে কেউ যেতে চায় না। এক মাঝি রাজি হয়েছে, তবে বলছে পাঁচশো মার্কিন ডলার দিতে হবে।'

ভুরু কোঁচকাল রানা। 'চেক নেবে?'

লীলাবতী শহরে আমেরিকান এক্সপ্লেস অফিস খোলা পেল ওরা, ওখান থেকে ক্রেডিট কার্ড ভাঙাতে রানার কোন অসুবিধে হলো না। লীনা বলল, 'রওনা হবার আগে কিছু খেয়ে নিলে হত না? নিজেকে আমার রাক্ষসী মনে হচ্ছে।'

'সূর্য ডুবতে এখনও দু'ঘণ্টার মত বাকি। হ্যাঁ, চলো।'

সুমাত্রায় প্রচুর প্রবাসী বাঙালী থাকে, আর চীনা বংশোদ্ভুত ইন্দোনেশিয়ানরা তো স্থানীয়; লীনার জন্যে সাপ-ব্যাঙ ও নুডলস আর রানার জন্যে মাছ-ভাত-ডাল পেতে কোন সমস্যা হলো না। হোটেলটা ছোট, তবে পরিচ্ছন্ন।

সৈকতে ফিরে এসে মাঝিকে টাকা দিল ওরা, উঠে বসল ফিশিং বোটে। নৌকাটায় এঞ্জিন লাগানো আছে।

সূর্য পাটে বসেছে, এই সময় রওনা হলো ওরা। ঢাকায় আবার ফোন করার সুযোগ থাকলেও লাইন নিরাপদ হবে না ভেবে ঝুঁকিটা রানা নিল না। দেশের রাজনৈতিক নেতারা ঢাকাকে রক্ষার জন্যে

কি ব্যবস্থা নিয়েছেন জানতে না পারায় টেনশনে ভুগছে। তবে খুব ভাল করেই জানে যে প্রায় এক কোটি লোককে মাত্র কয়েক ঘণ্টার নোটিসে অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলা সম্ভব হবে না। তাঁরা সম্ভবত চেষ্টা করবেন মিসাইলটাকে মাঝ আকাশে থামানোর। তবে সেটা ঢাকার আকাশে থামানো হোক বা বঙ্গোপসাগরের মাথায়, ক্ষতির পরিমাণ তাতেও খুব একটা কম হবে না। ওঅরহেড যদি ঢাকার আকাশে বিস্ফোরিত হয়, তেজস্ক্রিয়ায় মারা যাবে কয়েক লাখ মানুষ, ঢাকা সহ আশপাশের বিশাল এলাকার ফসল পুড়ে যাবে, কয়েক বছর খেতে-খামারে আর কোন ফসল ফলবে না, মরে যাবে সমস্ত গাছ-পালা আর জলাশয়ের মাছ, ব্যাপক হারে ক্যান্সার দেখা দেবে, সন্তান সম্ভবা মায়েরা বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম দেবে, সমস্ত জলাশয়ের পানি দূষিত হয়ে পড়বে। আর বঙ্গোপসাগরের ওপর বিস্ফোরিত হলে এলাকার সমস্ত সামুদ্রিক প্রাণী মারা যাবে।

রানা অনুভব করল, ওর ঘাড়ে হাজার টন বোঝা চাপানো হয়েছে। বাস্তব পরিস্থিতি এমনই, যা করার ওকেই করতে হবে। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই, সমস্যার একমাত্র সমাধান হলো সারফেসে থাকতেই ক্রুজ মিসাইলটাকে ধ্বংস করা। ওটার কাছাকাছি যে রয়েছে তাকেই এই অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে। আত্মত্যাগে ভীত নয়, রানা সিদ্ধান্ত নিয়েছে নিজের প্রাণের বিনিময়ে হলেও প্রাণপ্রিয় ঢাকাকে রক্ষা করতে চেষ্টা করবে ও। ঢাকাবাসী ওর একান্ত আপন, আত্মার আত্মীয়, তাদেরকে রক্ষা করার বিনিময়ে নিজেকে যদি মারা যেতে হয়, সেটা হবে ওর ধারণা, মহা এক গৌরবের বিষয়।

রানা আর লীনা বোটের বো-তে বসেছে, হাল ধরে মাঝি

বসেছে পিছন দিকে। দিনটা আজ অস্বাভাবিক দীর্ঘ ছিল, রানার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে যে শুরুটা করেছিল জাপানে, বড় একটা অংশ জাকার্তায় কাটিয়েছে, আর এখন সুমাত্রার উপকূলে রয়েছে।

কয়েক মিনিট কোন কথা হলো না, প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করল ওরা। তারপর রানা জিজ্ঞেস করল, 'তোমার মত একটা মেয়ে সিক্রেট সার্ভিসে কেন এল?'

'এই মুহূর্তটাই কি আদর্শ উত্তর হতে পারে না?' হাসছে লীনা। 'ঘনিয়ে আসা সন্ধ্যায় রহস্যময় এক পুরুষের সঙ্গে বিপজ্জনক একটা অভিযানে বেরিয়েছি। এ-ধরনের রোমাঞ্চের প্রতি কার না লোভ থাকে, বলো?'

লীনার কাঁধে একটা হাত রাখল রানা। 'দেশ আর শুভশক্তির সেবা করছ, এটা কখনও ভুলবে না।'

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে প্রস্তুতি নিতে শুরু করল ওরা। ইচ্ছে করেই ওদের দিকে তাকাচ্ছে না মাঝি, তবে হাবভাব দেখে বোঝা যায় নার্ভাস হয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যে রানা আর লীনা ওয়েট স্যুট পরে নিয়েছে। জোডিয়াক ভেলাটায় বাতাস ভরল রানা, নামিয়ে দিল পানিতে। রশির একটা মই বেয়ে ওটায় চড়ল লীনা, তার পিছু নিয়ে রানাও। দু'জনেই ওরা হাত নেড়ে মাঝির কাছ থেকে বিদায় নিল। ঘুরে মেইনল্যান্ডের দিকে ফিরে যাচ্ছে জেলে নৌকা। রানা আর লীনাকে নিয়ে জোডিয়াক ভেলা চলেছে রহস্যময় দ্বীপটার দিকে।

অন্ধকার গাঢ় হবার অপেক্ষায় আরও আধ ঘণ্টা দ্বীপটার কাছ থেকে দূরে থাকল ওরা। তারপর আকাশে তারার মেলা বসল। আধখানা চাঁদও আলো ছড়াচ্ছে। দ্বীপটাকে কালো একটা ছায়ার

মত লাগল দেখতে। ওটার কিনারায় বিন্দু আকারের বেশ কয়েকটা কৃত্রিম আলো ফুটল।

লীনা ধারণা করল, ‘আলোগুলো সম্ভবত কোন গুহার ভেতর জ্বলছে।’

জোডিয়াক সামান্য ঘুরিয়ে ওদিকে এগোল রানা।

‘গুহার সামনে কি যেন একটা নড়াচড়া করছে,’ বলল লীনা।

রানা দেখল, ফোঁটা আকৃতির আলোগুলোর সামনে দিয়ে বড়সড় আকৃতির একটা কাঠামো সরে যাচ্ছে, ছায়ার মত লাগছে দেখতে। আরও কাছাকাছি আসতে ওটাকে এক ধরনের জলযান বলে মনে হলো।

সী ঈল গোপন ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে খোলা সাগরে চলে আসছে।

জোডিয়াককে একটু ঘুরিয়ে নিল রানা, অদৃশ্য বোটটার পথের ওপর থাকতে চায়। কয়েক মুহূর্ত পর ওদের সামনে ওটা ঝুলতে দেখা গেল। কাঠামোটা যেন কোন সায়েন্স ফিকশন সিনেমার ফিউচারিস্টিক মেশিন, ডিজাইনটা পিচ্ছিল, অত্যাধুনিক টেকনলজির ফসল, ভীতিকর। দু'জনের কেউই কথা বলছে না, প্রকাণ্ড জলযান জোডিয়াক সহ ওদেরকে গ্রাস করে ফেলছে। সরাসরি সী ঈলের প্ল্যাটফর্মে ঢুকে পড়ল জোডিয়াক, দুই পনটুনের মাঝখানে।

স্টারবোর্ড পনটুনের দিকে একটা গ্র্যাপলিং হুক ছুঁড়ল রানা। সঙ্গে রশি আছে, পনটুনের সঙ্গে আটকাতেই বোটটা বেঁধে ফেলল লীনা, তাড়াতাড়ি হুকটা খুলে নিল রানা। প্রায় সেই মুহূর্তেই সী ঈলের স্পীড বেড়ে গেল।

'ঠিক সময় মত পৌঁছেছি আমরা,' বলল লীনা। সঙ্গে করে নিয়ে আসা লিমপেট মাইনগুলো বের করে দু'ভাগ করল সে। এই পরিস্থিতিতে অ্যাকুয়ালাঙ দরকার হবে না।

'বিশ মিনিটের ফিউজ, তবে পাঁচ মিনিটের মধ্যে সরে যেতে পারব আমরা। আমি দ্বিতীয় পনটুনে কাজ করব,' বলল রানা। মুখ তুলতে দেখল লীনা হাসছে। 'হাসির কি হলো?'

'ভাবছি আমি একটা মেয়ে হয়ে এই কাজ করছি দেখে তুমি অবাক হচ্ছ কিনা,' বলল লীনা। 'তোমার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, এরচেয়ে বড় বোটও উড়িয়েছি আমি।'

'মোটেও অবাক হচ্ছি না,' জবাব দিল রানা। 'আমার দেশের মেয়েদেরকে আমি মুক্তিযুদ্ধে লড়তে দেখেছি।'

কোমরে মাইন বেঁধে নিয়ে পানিতে লাফ দিল লীনা, তারপর মাথার ওপর একটা পোল দেখতে পেয়ে খপ করে ধরে ফেলল। পোলে হাত বদল করে এগোল সে, পৌঁছে গেল একদিকের পনটুনে।

সী ঈলের ব্রিজে ক্যাপটেনের পাশে দাঁড়িয়ে রেডার ডিসপ্লে দেখছে ফাউলার, এতই নার্ভাস যে কপালের একটা শিরা বারবার লাফাচ্ছে। ওদের পিছনে মেনাচিম, মনিবের হুকুম পাবার অপেক্ষায় এক পায়ে খাড়া।

ক্যাপটেন বলল, 'আগেই বলেছি, সাউথ চায়না সী থেকে নয়, ভারত মহাসাগরের কোথাও থেকে রওনা হয়ে বঙ্গোপসাগরের দিকে চলে আসছে ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ এইচএমএস নরফোক। আর বাংলাদেশী গানবোট আরও আগে রওনা হয়েছে শ্রীলংকা

থেকে। গান বোটই আগে পৌঁছুবে, স্যার।’

মাথার চুলে আঙুল চালাল ফাউলার। ‘তারমানে মাসুদ রানা চীন আর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট পাঠাতে পেরেছে। আমাদের কৌশল ফাঁস হয়ে গেছে, দুই দেশের মধ্যে আর কোন ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার নেই।’ ক্যাপটেনকে নির্দেশ দিল, ‘দু’দেশের জাহাজগুলোর মাঝখানে পৌঁছুবার চেষ্টা করো। ফুল স্পীড।’

সী ঈলের চারধারে ফিট করা ভিডিও ক্যামেরা থেকে সিগনাল আসছে মনিটরে, একজন সিকিউরিটি অফিসার সেদিকে নজর রাখছে। একটানা চব্বিশ ঘণ্টা ধরে সবাই তারা কাজে ব্যস্ত, ফলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। অফিসার হাত দিয়ে চোখ রগড়াল, আর ঠিক ওই সময় মনিটরের একপাশ থেকে আরেক পাশে সরে গেল রানা, অফিসার দেখতে পেল না। ওদের ভাগ্যই বলতে হবে, জোডিয়াকটা ক্যামেরায় ধরা পড়েনি।

পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর বাংলাদেশ আর ব্রিটেনের দুটো জাহাজের মাঝখানে পজিশন নিল সী ঈল।

হাতঘড়ির দিকে তাকাল ফাউলার। সিদ্ধান্ত নিল, এখনই সময়। ‘ঠিক আছে, কাজ শুরু করা যাক। দু’দেশের বোট লক্ষ্য করে একটা করে মিসাইল ছোঁড়ো। টার্গেটে যেন না লাগে, তবে কাছাকাছি পড়া চাই।’

পনটুনে মাইন বসাতে ব্যস্ত রানা, সেই সঙ্গে ভাবছে বিস্ফোরণ শুরু হয়ে গেলে ওরা পালাবে কিভাবে। জোডিয়াকের গতি খুব বেশি নয়। ফাউলারের ক্রুরা ওদের উপস্থিতি টের পেয়ে গেলে, কিংবা লিমপেট মাইন ফাটতে শুরু করার সময় ওদেরকে যদি পালাতে

দেখে ফেলে, পাখি শিকারের মত সহজেই গুলি করে ফেলে দেবে।

কি করা যায় ভাবছে, এই সময় কান ফাটানো আওয়াজে চমকে উঠল ও, মাত্র কয়েক ফুট দূর থেকে গরম আঁচ লাগল মুখে। প্রথম মিসাইল ছোঁড়া হয়েছে, রাতের অন্ধকার আকাশ চিরে ছুটে যাচ্ছে সেটা। ঘাড় ফিরিয়ে লীনার দিকে তাকাল ও। তার দিকের পনটুন থেকে দ্বিতীয় মিসাইল ছোঁড়া হলো, সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠল লীনা। পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা, কে কি ভাবছে ধরতেও পারল। ব্যাপারটা শুরু হয়ে গেছে। তবে একাধিক মিসাইল নিক্ষেপ খানিকটা স্বস্তিকর, সম্ভবত আতঙ্ক সৃষ্টিই উদ্দেশ্য। ওঅরহেড ফিট করা ক্রুজ মিসাইল ফাউলারের কাছে মাত্র একটাই থাকার কথা। তাছাড়া, ওটা যদি ঢাকায় ফেলতে হয়, বোট আর ঢাকার সঙ্গে দূরত্ব আরও কমিয়ে আনতে হবে ফাউলারকে। আরও সময় দরকার তার।

হাতের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। মাইনগুলো নিয়ে সী ঈলের বোর দিকে এগোল লীনা।

দ্রুত হাত চালাল রানা, জানে ফাউলারের মিসাইল যে-কোন মুহূর্তে টার্গেটে পৌঁছে যাবে। গানবোট হালকা হওয়ায় স্পীড খুব বেশি, মিসাইলটাকে আসতে দেখলে এড়িয়ে যেতে পারবে। আর ব্রিটিশ ফ্রিগেটে আছে হিট-সীকার সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল, ফাউলারের মিসাইলকে আকাশেই বাধা দেয়া সম্ভব। তবে গানবোট আর ফ্রিগেট যদি এদিকে পাল্টা মিসাইল ছোঁড়ে, লীনা আর ওর বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। সে দেখা যাবে, ভেবে

স্টারবোর্ড পনটুনের একটা অবলম্বন বেয়ে খানিকটা ওপরে উঠল ও। এমন এক জায়গায় মাইন বসাল, ফাউলারের লোকরা একটু খোঁজ করলেই যাতে দেখতে পায়। এরপর অবলম্বনের আরেক পাশে চলে এল ও, এখানে আরও একটা লিমপেট বসাল। সতর্ক একজন গার্ড প্রথম মাইনটা পেয়ে গেলেই সন্তুষ্ট বোধ করবে, উল্টোদিকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে আরেকটা মাইন আছে এই সন্দেহ তার মনে জাগবে না। পনটুনের নানা জায়গায় মাইন বসানোর কাজ চালিয়ে যাচ্ছে ও, আর একটুর জন্যে ঘুরন্ত ভিডিও ক্যামেরার সামনে পড়ে যাচ্ছিল। সময় থাকতে মাথা নিচু করে সরে এল তাড়াতাড়ি। দ্বিতীয় পনটুনের দিকে তাকাল লীনাকে সতর্ক করার জন্যে। কিন্তু তাকে কোথাও দেখতে পেল না।

এখন আর লীনাকে নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই। বিপদ আর পরিণতি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন সে। হাতের কাজ শেষ করায় মন দিল রানা।

‘যেমন চেয়েছিলাম, আমাদের মিসাইল টার্গেট মিস করেছে,’ সী ঈলের ক্যাপটেন রিপোর্ট করল ফাউলারকে। ‘তবে দুটোর একটাও পানিতে পড়েনি, বিস্ফোরিত হয়েছে আকাশে থাকতেই।’

‘এটা দুঃসংবাদ,’ বিড়বিড় করল ফাউলার। ‘এর মানে হলো, গানবোট আর ফ্রিগেট থেকে সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল ছুঁড়ে আমাদের মিসাইল দুটোকে অকেজো করে দিয়েছে ওরা।’

‘এ-ও পরিষ্কার যে গানবোট আর ফ্রিগেট থেকে যে মিসাইল ছোঁড়া হয়েছে সেগুলো হিট-সীকার, মি. ফাউলার,’ বলল খায়রুল কবির।

‘আমাকে জ্ঞানদান করতে হবে না, আমি জানি,’ কর্কশ সুরে বলল ফাউলার। কবিরের সঙ্গে কথা বলছে, তাই নিজেকে তার নিয়ন্ত্রণে রাখতে হচ্ছে। ‘তবে মনে হচ্ছে আপনি আরও কি যেন বলতে চান।’

‘হ্যাঁ। এখনও সময় আছে, মি. ফাউলার।’ শান্ত ও নির্লিপ্ত দেখাচ্ছে কবিরকে। ‘ইচ্ছে করলে সী ঈলকে ঘুরিয়ে নিয়ে কেটে পড়তে পারি আমরা। তবে যে স্পীডে গানবোট আর ফ্রিগেট এগিয়ে আসছে, পালানো খুব সহজ হবে না। সেক্ষেত্রে স্‌রকেল নিয়ে আমরা তিনজন- আমি, আপনি আর মেনাচিম- কেটে পড়তে পারি। কাকতালীয়ই বলতে হবে, সী ঈলে মাত্র তিনটে স্‌রকেলই আছে।’

‘আমি আপনাকে কাপুরুষ বলে অপমান করব না,’ ফাউলার বলল। ‘তবে আর কেউ কথাটা শুনলে কাপুরুষ ছাড়া আর কিছু বলবে না আপনাকে।’

‘আমার দায়িত্ব আপনাকে সৎ পরামর্শ দেয়া,’ ঠাণ্ডা সুরে বলল কবির। স্প্লীজ, মি. ফাউলার, ব্যবসা করতে নেমে ব্যক্তিগত শত্রুতাকে গুরুত্ব দেবেন না। মাসুদ রানাকে আপনি চেনেন না। বিসিআই সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা নেই। জানি, বললে আপনি বিশ্বাস করবেন না, মাসুদ রানা একাই অন্তত বিশবার তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঠেকিয়েছে, বাধতে দেয়নি। আপনার কথা জানি না, তবে আমি খোদায় বিশ্বাস করি। আমার ধারণা, খোদার বিশেষ কৃপা আছে ওই ছোকরার ওপর- আমি বলতে চাইছি, খোদা ওকে দিয়ে নিজের বিশেষ বিশেষ কিছু কাজ করিয়ে নেন। কাজেই ওর বিরুদ্ধে লাগা মানে খোদার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা।’

‘আপনি আসলে গুলিয়ে ফেলছেন,’ হেসে উঠে বলল ফাউলার। ‘ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করছি আমি, মাসুদ রানা নয়। বললে আপনিও বিশ্বাস করবেন না যে একটা স্বপ্নের মাধ্যমে দুনিয়ার সবচেয়ে ক্ষমতাবান মানুষ হবার প্রেরণা যোগানো হয়েছে আমাকে। সেই স্বপ্নে উৎসাহদাতা ছিলেন কয়েকজন দেবদূত। আর দেবদূতরা যে ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করেন, এ-কথা কে না জানে। ওই স্বপ্নেই আমাকে বলা হয়েছে, শত্রুপক্ষ যত শক্তিশালীই হোক, কেউ তারা আমার সামনে দাঁড়াতে পারবে না। তর্ক-বিতর্ক অনেক হয়েছে, এবার অ্যাকশন শুরু...মর তোরা, জাহান্নামে যা, নরকে পচ...’

সবাই স্থির হয়ে গেল, হতভম্ব। কারও কোন ধারণা নেই ফাউলার কেন উত্তেজিত হলো।

‘তোদেরকে আমি বেতন দিই কেন?’ সিকিউরিটি কনসোলের দিকে ছুটে গেল ফাউলার। ওখানে বসা একজন অপারেটরের চুল খামচে ধরে মাথাটা একটা মনিটরের দিকে ঘোরাল। যে ক্যামেরা পোর্টসাইড পনটুন এরিয়া কাভার করছে তার ছবি ফুটে রয়েছে মনিটরে। কিন্তু মনিটরের স্ক্রীনে বিশেষ কিছু নেই, কাজেই কনসোল অপারেটর বিহ্বল দৃষ্টিতে ফাউলারের দিকে তাকাল।

‘ক্যামেরা অন্য দিকে ঘুরে গেছে, গাধার বাচ্চা!’ হুঙ্কার ছাড়ল ফাউলার। ‘ম্যানুয়ালে দে, ফিরিয়ে আন আগের জায়গায়!’

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে, কারণ এখনও ফাউলার তার চুল ধরে আছে, আগের জায়গায় ক্যামেরাটা ফিরিয়ে আনল অপারেটর। এবার স্ক্রীনে লীনাকে দেখা গেল। যদিও লীনা ব্যাপারটা সম্পর্কে সচেতন নয়।

মনিটর থেকে চোখ ফিরিয়ে মেনাচিমের দিকে তাকাল ফাউলার। 'এই শালা বানচোতকে উচিত শিক্ষা দাও!' অপারেটরের মাথা ছেড়ে দিল সে, হাতে তার চুল রয়ে গেল।

এগিয়ে এসে অপারেটরের ঘাড়ে কারাতে কোপ মারল মেনাচিম। মট করে একটা আওয়াজ হলো।

'মেয়েটা এখানে, তারমানে মাসুদ রানাও এখানে,' বলল ফাউলার। 'মেনাচিম, ধরো ওদেরকে। ধরো, তারপর খুন করো।'

হুকুম শুনেই ছুটল মেনাচিম। লাশটার দিকে তাকিয়ে একজন গার্ডকে ফাউলার বলল, 'জঞ্জালটাকে পানিতে ফেলে দাও।' ঘুরে নিজের প্রাইভেট কোয়ার্টারে চলে গেল সে।

পোর্টসাইড পনটুনে শেষ মাইনটা বসিয়ে হাতের কাজ শেষ করল লীনা। এখন রানাকে খুঁজে নিয়ে সী ঈল থেকে দূরে সরে যেতে হবে। কুণ্ডলী পাকিয়ে ছিল শরীরটা, সিধে করল, আর ঠিক তখনই ব্যাঙ যত দ্রুত জিভ বের করে পোকা ধরে, সেই একই ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তার পিঠে ছোবল মারল মেনাচিম, হ্যাচের ভেতর টেনে নিয়ে তুলে ফেলল সী ঈলে। 'চার' নম্বর লেখা একটা অ্যাকসেস এরিয়ায় রয়েছে ওরা, মই আর হ্যাচ ছাড়া আর কিছু নেই এখানে। লীনার কোমর পেঁচিয়ে ধরেছে মেনাচিম, বুনো বিড়ালের মত ধস্তাধস্তি করছে মেয়েটা। চারজন গার্ডকে নির্দেশ দিল মেনাচিম, তাদের প্রত্যেকের কাছে একটা করে এমপিফাইভকে সাব-মেশিন গান।

'হ্যাচ গলে বেরিয়ে যাও,' লোকগুলোকে হুকুম করল মেনাচিম। 'দেখামাত্র গুলি করবে। সাবধান, ব্যাটা খুব ধুরন্ধর।

আরও লোক পাঠাচ্ছি, তারা মাইনগুলো খুঁজতে তোমাদেরকে সাহায্য করবে।'

মেনাচিমকে স্যালুট করে হ্যাচ গলে বেরিয়ে গেল তারা।

লীনাকে নিয়ে মই বেয়ে ওপরে উঠছে মেনাচিম। তার আশা বস্ যেহেতু কথা দিয়েছেন, মেয়েটাকে অবশ্যই তার হাতে তুলে দেয়া হবে।

সী ঈলের বাইরে, স্টারবোর্ড পনটুনের একটা অবলম্বন ঘুরে খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসছে রানা, একটুর জন্যে একজন গার্ডের সঙ্গে ধাক্কা খেলো না। ওর মত গার্ডও চমকে উঠেছে। হাতের অস্ত্রটা তুলল সে, কিন্তু তার আগেই বিদ্যুৎ খেলে গেছে রানার হাতে। সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলটা গার্ডের মাথায় সবেগে নেমে এল, জ্ঞান হারিয়ে পানিতে পড়ল সে, সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে গেল।

পিছিয়ে একটা খোপের ভেতর ঢুকে পড়ল রানা, সাব-মেশিনগান থেকে বিস্ফোরিত এক পশলা বুলেট পাশ কাটাল ওকে। অজ্ঞান গার্ডের পিছনে দ্বিতীয় একজন ছিল। চোখের কোণ দিয়ে আরও দু'জনকে দেখতে পেল রানা, দ্বিতীয় পনটুন থেকে ওর দিকে অস্ত্র তাক করছে। হাত লম্বা করে পরপর দুটো গুলি করল ও, কোন শব্দ হলো না। দু'জন গার্ডই ঝাঁকি খেয়ে পড়ে গেল পানিতে, ডুবে গেল অতল গভীরে। বিরতি না নিয়ে ঘুরল রানা, তৃতীয় গুলিটা করল অপর গার্ডের গলায়। নিজের গলা চেপে ধরে সে-ও তলিয়ে গেল। ডাইভ দিয়ে আরেকটা খোপে ঢুকল রানা, সেই মুহূর্তে ওর সামনের একটা হ্যাচ খুলে যেতে দেখল। সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিল, পুরোপুরি খোলার পর ওটার ঠিক পিছনে

থাকতে চায়।

হ্যাচটা থেকে তিনজন গার্ড বেরিয়ে এল। একজন ওখানেই স্থির হয়ে থাকল, বাকি দু'জন রানাকে খুঁজতে চলে গেল। নিঃসঙ্গ গার্ড ঘাড়ের পিছনে পিস্তলের মাজল অনুভব করল। অপর হাতে নিজের শোল্ডার প্যাক খুলে লোকটাকে পরিয়ে দিল রানা, তারপর প্রচণ্ড এক ধাক্কা মারল পিঠে। আওয়াজ শুনে লোকটার বাকি দু'জন সঙ্গী ঝট করে ঘাড় ফেরাতেই পিঠে প্যাক সহ কালো শার্ট পরা কাঠামোটাকে দেখে রানা বলে মনে করল। মুহূর্ত মাত্র ইস্ত তত না করে গুলি করল তারা। গার্ডের শরীর ঝপাৎ করে পড়ল পানিতে, সে রানা নয় তা কেউ বুঝতে পারার আগেই ডুবে গেল।

হ্যাচের ভেতর লুকিয়ে পড়ল রানা, এটা 'টু' লেখা অ্যাকসেস এরিয়া। ঢাকনি বন্ধ করে মই বেয়ে উঠে আসছে ও। প্রায় নিশ্চিতভাবে জানে, লীনাকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে।

নিজের প্রাইভেট কোয়ার্টারে, ডেস্কে বসে আছে ম্যাডক ফাউলার। ব্রিজ থেকে একটা প্যাঁচানো সিঁড়ি উঠে এসেছে এই কামরায়। সারি সারি ভিডিও মনিটর দিয়ে সাজানো দেয়ালের দিকে মুখ করে বসেছে সে, ব্রিজের বিভিন্ন স্তরে সাজানো ভিউস্ক্রীনে যা দেখা যাচ্ছে এখানকার মনিটরগুলোতে তারই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠছে। প্রাইভেট কোয়ার্টারে অতিরিক্ত আরও কয়েকটা মনিটর রয়েছে, সেগুলোয় তার মিডিয়া সাম্রাজ্যের বিভিন্ন মাধ্যম থেকে খবরের শিরোনাম ফুটছে। তার পাশেই বসে রয়েছে টেকনোটেরোরিস্ট খায়রুল কবির, নার্ভাস ভঙ্গিতে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি ধরে অনবরত মোচড়াচ্ছে। ফাউলারও তার চোয়াল ডলছে।

ব্যথাটা বড় বেশি ভোগাচ্ছে তাকে।

ইন্টারকম বেজে উঠল। রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল ফাউলার। রানা মারা গেছে, লাশটা তলিয়ে গেছে সাগরে, শুনে কর্কশ স্বরে প্রশ্ন করল, 'কোনও সন্দেহ নেই তো? গুড। এবার মাইনগুলো খুঁজে বের করো। মেনাচিম কোথায়?'

মেনাচিমকে দেখা গেল প্যাঁচানো সিঁড়ি বেয়ে ব্রিজ থেকে উঠে আসছে, তার বাহু বন্ধনের ভেতর এখনও হাত-পা ছুঁড়ছে লীনা।

কেউ শুনতে পেল না, কবির বিড়বিড় করল, 'ধিক, মেনাচিম!' সম্ভবত উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত বলেই নারী নির্যাতনের ঘোর বিরোধী সে।

ইন্টারকম বন্ধ করে দিল ফাউলার। চেহারায় করুণ আবেদন বা আবদারের ভঙ্গি, তাঁর দিকে এগিয়ে এল মেনাচিম। 'স্যার, আপনি আমার মা-বাপ। আপনি যা বলবেন আমি তাই করব। খুব ভাল করেই জানি, এই ডাইনীটাকে আপনি মেরে ফেলতে বলবেন। কিন্তু আমার একটা আর্জি আছে, স্যার। আপনিই বলেছিলেন, ধরতে পারলে একে আমার হাতে তুলে দেয়া হবে। কথা দিচ্ছি, ও কোন ঝামেলা করার সুযোগই পাবে না...'

'ঝামেলা কাকে বলে টের পাবি, বেজন্মা কুত্তা...,' মেনাচিমের মুখে এক দলা থুথু ফেলল লীনা। ভাঁজ করা হাঁটু দিয়ে মেনাচিমের ঊরুসন্ধিতে প্রচণ্ড একটা গুঁতো মারল সে। ফাউলার ও কবির শিউরে উঠল, কিন্তু মেনাচিমের কোন প্রতিক্রিয়াই হলো না।

বরং হাসতে হাসতে বলল, 'এরকম সুড়সুড়ি দিলে আমি আরও উত্তেজিত হয়ে পড়ি।' তারপর পটকা ফাটার মত আওয়াজ হলো একটা। লীনাকে চড় মেরেছে সে। জ্ঞান হারিয়ে নেতিয়ে

পড়ল লীনা। মেনাচিম ছেড়ে দিতে ঢলে পড়ল মেঝেতে। ‘স্যার,’ বলল মেনাচিম। স্প্লীজ, পুরো দৃশ্যটা ভিডিওতে ধরে রাখব আমি, কথা দিচ্ছি।’

‘ঠিক আছে,’ বলল ফাউলার। ‘তুমি ওকে পেলে, ডিক।’

‘ধিক! ধিক!’ ফিসফিস করল কবির।

একটা বোতামে চাপ দিল ফাউলার, কামরায় তিনজন গার্ড ঢুকল। নির্দেশ দিল, ‘মেয়েটাকে লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে ডিকের কামরায় রেখে এসো।’

‘জয় হোক আপনার। আপনার জয় হোক!’ কৃতজ্ঞতায় মেনাচিমের চোখ জোড়া আধবোজা হয়ে এল।

‘তবে, প্রথমে মাইনগুলো সরাতে হবে,’ জেদের সুরে বলল ফাউলার।

‘ইয়েস, স্যার!’

গার্ডদের হাতে লীনাকে তুলে দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নেমে গেল মেনাচিম। মেঝেতে নড়েচড়ে উঠল লীনা, গার্ডরা ঝট করে তার দিকে সাব-মেশিনগান তাক করল।

‘এ-ধরনের নোংরা আবদার রক্ষা করা ব্যবসায়িক স্বার্থের জন্যে ক্ষতিকর,’ মন্তব্য করল কবির। ‘বলা উচিত নয়, আবার না বলেও পারছি না, আপনাকে চিনতে খানিকটা ভুল হয়েছে আমার। আপনি পুরোপুরি ব্যবসায়ী নন।’

‘শত্রু নিধনকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিই আমি,’ গম্ভীর সুরে বলল ফাউলার। ‘ঢাকার অস্তিত্ব বিলীন করে দিয়ে আমি আমার সমস্ত শত্রুর সামনে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চাই। আমার সঙ্গে লাগতে এলে কি পরিণতি হতে পারে, এ থেকে তারা একটা

আভাস পাবে। তারপর দেখবেন কেমন ব্যবসায়ী আমি। আর মেনাচিমের কথা যদি বলেন, কাজের লোককে পুরস্কৃত করতে ভালবাসি আমি। আপনিও কাজের লোক। সময় হোক, আপনাকেও আমি সন্তুষ্ট করব।'

কথা না বলে হাত তুলে কপালটা টিপে ধরল কবির।

দশ

অদৃশ্য সী ঈলের পনটুনগুলোর চারধারে সাবধানে তল্লাশী চালাচ্ছে মেনাচিমের গার্ডরা, রানা আর লীনার ফিট করা লিমপেট মাইনগুলো খুঁজছে। এক এক করে খুলে নিয়ে পানিতে ফেলে দিচ্ছে ওগুলো।

মেনাচিমও ওদের সঙ্গে যোগ দিল। তার বুদ্ধি খানিকটা ভোঁতা হলেও, ইন্সটিঙ্কট খুব চোখা। বিপদের গন্ধ পায় সে, মাঝে মধ্যে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যও পায়।

একটা সাপোর্টে তল্লাশী চালাচ্ছিল সে, সন্দেহ করছে এটার গায়ে রানা মাইন রেখে গেছে। খোঁজার শুরুতে পেয়েও গেল। খুলে নিয়ে মাইনটা পানিতে ফেলে দিল সে। সাপোর্ট ছেড়ে সরে যাবে, তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সতর্ক করে দিল। ধীরে ধীরে ঘুরল সে, ফিরে এল আবার সাপোর্টের কাছে। ওটা বেয়ে খানিকটা ওপরে উঠল সে, হাত দিয়ে পিছন দিকটা হাতড়াচ্ছে। এবার রানার রেখে যাওয়া দ্বিতীয় মাইনটাও পেয়ে গেল। নিজেকে নিয়ে গর্ব অনুভব করল মেনাচিম, মাইনটা খুলে ফেলে দিল পানিতে। মনে মনে

ভাবল, বস্ খুব খুশি হবেন।

মেনাচিম লক্ষ করেছে, মাসুদ রানার প্রসঙ্গে সমীহের সঙ্গে কথা বলেন বস্। লোকটাকে তার পাওয়া উচিত ছিল। গুলি খেয়ে মারা গেল, তারপর সাগরে তলিয়ে গেল, এটা তাকে সন্তুষ্ট করতে পারছে না। বস্ যতই সম্মান দেখাক, লোকটা বসের সর্বনাশ করার জন্যে এসেছিল। আর বসের সর্বনাশ করা মানে তারও সর্বনাশ করা। কাজেই ওই ব্যাটার মৃত্যু হওয়া উচিত ছিল তার হাতে।

তবে সান্ত্বনা এই যে লোকটার সঙ্গিনী এখন তার কব্জায়। মেয়েটাকে বস্ তার হাতে তুলে দিয়েছেন। মাসুদ রানাকে হাতে পেলে সে যা করত, এখন মেয়েটাকে নিয়ে তা-ই করবে মেনাচিম। টরচারটা আরও বরং বেশি উপভোগ্য হবে। ধৈর্যে কুলাচ্ছে না, মাইনগুলো তাড়াতাড়ি খুঁজে বের করা দরকার।

প্রাইভেট অফিসে পায়চারি করছে ম্যাডক ফাউলার। সামনে একটা কমপিউটর নিয়ে ঝড়ো গতিতে কাজ করছে খায়রুল কবির। এখনও মাঝে মধ্যে বিড়বিড় করছে সে, তবে ফাউলার তা শুনতে পাচ্ছে না। ফাউলারের ওপর খেপে আছে সে, এ তারই প্রতিক্রিয়া, 'ম্যাডক ফাউলার! বাপ লম্পট হলেও তুখোড় ব্যবসায়ী ছিল, শালার ছেলেটা হয়েছে পাগলা কুত্তা!' কাজের ফাঁকে আবার বলল, 'বানচোত নিজেও ডুববে, আমাকেও ডোবাবে!'

'আর কতক্ষণ লাগবে?' জানতে চাইল ফাউলার। 'ঢাকা কি এখনও রেঞ্জের মধ্যে আসেনি?'

'টার্গেটিং ডাটা সবেমাত্র কমপিউটরে ভরা হলো,' জবাব দিল

কবির। 'কয়েক সেকেন্ড সময় দিন।'

'গুড। কিন্তু গানবোট আর ফ্রিগেট? এই মুহূর্তে ওগুলো কোথায়? কত কাছে?'

'আপনাকে তো আগেই সাবধান করেছিলাম। মাসুদ রানাকে ছোট করে দেখা উচিত হয়নি,' বলল কবির। 'সে হয়তো মারা গেছে, কিন্তু সর্বনাশ যা করার করে দিয়ে গেছে।'

'মানে?'

'আমাদের কৌশল ফাঁস করে দিয়ে গেছে সে,' বলল কবির। 'বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ কয়েক ঘণ্টা আগেই জেনে ফেলেছে আমরা কি করতে যাচ্ছি। হাতে সময় পাওয়ায় গানবোট পাঠিয়েছে ওরা, ব্রিটিশ ফ্রিগেট এইচএমএস নরফোকও ভারত মহাসাগর থেকে রওনা হয়েছে।'

'তাতে কি? সী ঈল ওদের রেডারে ধরা পড়বে না।'

'তা পড়বে না। কিন্তু আমরা যেভাবে একের পর এক মিসাইল ছুঁড়ছি, সী ঈলের পজিশন আন্দাজ করতে কতক্ষণ?'

'আপনি শুধু শুধু ভয় পাচ্ছেন।' ইন্টারকমের বোতামে চাপ দিল ফাউলার। 'ক্যাপটেন, সী ঈলকে ফায়ারিং পজিশনে এনে থামান।'

চোয়াল ডলছে ফাউলার, তবে এই মুহূর্তে এত বেশি উত্তেজনা বোধ করছে যে ব্যথাটা প্রায় অনুভবই করছে না। ঢাকা ধূলিসাৎ হওয়া সংক্রান্ত সমস্ত খবর কমপিউটরের সাহায্যে এরই মধ্যে লিখে ফেলা হয়েছে। খবরগুলো এমনভাবে সাজানো হয়েছে, মূল কাহিনী সংখ্যায় হবে একাধিক, তবে প্রতিটিতেই প্রকৃত বা বাস্তব পরিস্থিতির আংশিক হলেও বিস্তারিত বিবরণ থাকবে, বোতামে

চাপ দেয়া মাত্র বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম থেকে ছড়িয়ে পড়বে সারা দুনিয়ায়। ঢাকায় নিউক্লিয়ার ডিভাইস বিস্ফোরিত হবার পর বিপর্যের প্রকৃতি যা-ই হোক, হাতে বিভিন্ন বর্ণনা তৈরি থাকায় প্রকৃত অবস্থার বিবরণ প্রচার করতে কোন সমস্যা হবে না। হাতে অনেকগুলো বর্ণনা থাকায় বাস্তবের সঙ্গে যেটা মিলবে সেটাই সে সময় মত ব্রডকাস্ট করতে পারবে।

সমস্ত আয়োজন শেষ, এখন শুধু বোতামে চাপ দেয়াটা বাকি। বহু বছর পর নিজেকে অসম্ভব ক্ষমতাধর বলে মনে হচ্ছে তার, প্রায় ঈশ্বরের কাছাকাছি।

সী ঈলের ভেতরে ঢুকে পড়েছে রানা, বাল্কহেডের কাছাকাছি একটা লোয়ার ক্যাটওয়াকে রয়েছে। ক্যাটওয়াকের অপরপ্রান্তে তিনজন গার্ডকে দেখতে পেয়ে দেয়ালে পিঠ ঠেকাল ও, এই ফাঁকে দ্রুত সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলের ম্যাগাজিনটা চেক করে নিল। সেরেছে, আর মাত্র দুটো বুলেট আছে। হাঁটুর নিচে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা খাপ থেকে কমব্যাট নাইফটা বের করল, তৈরি হলো হামলার জন্যে।

গার্ড তিনজন নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, বাইরে বেরিয়ে মাইন খুঁজতে পাঠানো হয়নি বলে খুব খুশি। তার ওপর বস্ বলেছেন, সব যদি ভালভাবে ঘটে, সবাইকে মোটা অঙ্কের বোনাস দেয়া হবে।

'ভাল বোনাস পেলে আরেকটা বিয়ে করব আমি,' একজন গার্ড বলল।

'ধ্যেত, বিয়ের ঝামেলায় কোন শালা যায়,' দ্বিতীয় গার্ড বলল।

'আমি একটা করে গার্লফ্রেন্ড ধরব আর ছাড়ব।'

তৃতীয় গার্ড বলল, 'আমি বাজে খরচ পছন্দ করি না। বোনাসের টাকা ব্যাংকে রেখে দেব, বিপদের দিনে কাজে লাগবে।'

ইতিমধ্যে চুপিসারে ওদের কাছাকাছি সরে এসেছে রানা। ওদের আলোচনায় বাধা দিল প্রথম গার্ডের সোলার প্লেক্সাসে ছোরার ফলা ঢুকিয়ে। একই সঙ্গে অপর হাতে ধরা পিস্তল থেকে দুটো গুলি বেরুল, বিস্ফোরিত হলো দ্বিতীয় ও তৃতীয় গার্ডের খুলি। পিছনে একটা শব্দ হতে ঝট করে ঘুরল ও, দেখল এই মাত্র আরও একজন গার্ড ক্যাটওয়াকে বেরিয়ে এসেছে। লোকটা কিছু বুঝতে পারার আগেই রানার ছোরা তার বুকে গেঁথে গেল। মাত্র দুই সেকেন্ডের মধ্যে কাজ শেষ। ছোরাটা হ্যাঁচকা টানে বের করে ওই লোকের শার্টেই রক্ত মুছল ও।

ডাক্ট টেপের একটা রোল দেখা যাচ্ছে ক্যাটওয়াকে। চোখে পড়তে রানার মাথায় একটা আইডিয়া ঢুকল। রোলটা তুলে পকেটে ভরল ও।

কোথায় রয়েছে, এরপর কোনদিকে যাবে, ঠিক করার জন্যে কয়েক সেকেন্ড সময় নিল রানা। সবচেয়ে আগে জানা দরকার লীনার কি হলো। মেয়েটা নিঃস্বার্থভাবে ওকে সাহায্য করতে এসেছে। সে কি এখন ওদের হাতে বন্দী?

লীনা বন্দী হলে ক্রুজ মিসাইলের ব্যবস্থা একাই করতে হবে ওকে। যদিও রানা জানে না কিভাবে সেটা সম্ভব।

*

ফায়ারিং পজিশনে পৌঁছে ধীরে ধীরে থেমে গেল সী ঈল। চাঁদের

আলোয় গাঢ় একটা ছায়া, ঢেউয়ের মাথায় দোল খাচ্ছে, যেন পানির গায়ে শান্তভাবে ঘুমাচ্ছে একটা তিমি।

স্টার্নের দিকে ওঅর্ক প্ল্যাটফর্মে একা টহল দিচ্ছে একজন গার্ড। কাছেই একটা লকার রূম, ভেতরে টুলস ও সাপ্লাই রাখা হয়। স্প্রে পেইন্টের কয়েকটা ক্যান লকার রূমের সামনে গড়াগড়ি খাচ্ছে, পাশেই একটা ইলেকট্রিক করাত, লকার থেকে তার বেরিয়ে এসেছে। সন্দেহ হওয়ায় সাব-মেশিনগান বাগিয়ে ধরে লকারটার দিকে এগোল গার্ড। তিন পর্যন্ত গুনে লকারটা খুলে ফেলল সে। ভেতরে হাত-পা বাঁধা ও মুখে কাপড় গোঁজা দু'জন গার্ডকে দেখে হতভম্ব হয়ে পড়ল। সতর্ক হবার সময় পেল না, ঘাড়ে প্রচণ্ড এক রদ্দা খেয়ে ছিটকে পড়ল ধাতব লকারের গায়ে, কপালের কাছ থেকে খুলিটা দু'ফাঁক হয়ে গেল। লোকটা ঢলে পড়তে তার হাত থেকে হেকলার অ্যান্ড কোচ সাব-মেশিনগানটা তুলে নিল রানা। লোকটাকে লকারে ভরল ও, স্প্রে পেইন্টের একটা ক্যান আর ইলেকট্রিক করাতটা হাতে নিল। এ-ধরনের আরও কয়েকটা জিনিস সংগ্রহ করেছে ও।

নিঃশব্দে জাহাজের সবচেয়ে উঁচু লেভেলে উঠে এল রানা। স্টার্ন প্ল্যাটফর্ম থেকে ভারী একটা মেশিনারির দিকে ঝুঁকল। যা খুঁজছিল পেয়ে গেছে।

প্ল্যাটফর্মের কিনারা থেকে ঝুঁকে নিচে তাকিয়ে জাহাজের পিছন দিকে ফাঁকা একটা জায়গা দেখতে পাচ্ছে রানা, সেই সঙ্গে স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছে ক্রুজ মিসাইলটাও। ওটা শুয়ে আছে ভারী একটা ইস্পাতের লঞ্চ টিউবে, টিউবটা সী ঈলের পাশে সমান্তরাল রেখায় রয়েছে। আশপাশে কোন গার্ডকে দেখা যাচ্ছে

না।

লঞ্চ টিউবের কাছে নেমে এসে ক্রুজ মিসাইলটা দ্রুত পরীক্ষা করল রানা। ওর জানা আছে ক্রুজ মিসাইল একাই বিশাল এলাকা জুড়ে ব্যাপক ধ্বংসকাণ্ড ঘটাতে পারে। তার সঙ্গে যদি একটা নিউক্লিয়ার ওঅরহেড ফিট করা হয়, ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ কয়েকশো বা হয়তো কয়েক হাজার গুণ বেড়ে যাবে। নিউক্লিয়ার ওঅরহেড সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ না হলেও, মিসাইলের মাথায় লকিং স্ক্রু দিয়ে আটকানো ওঅরহেডের আকার দেখে আন্দাজ করল, জিনিসটা পঁয়ত্রিশ মেগাটনের কম হবে না। গুনে দেখল রানা, আঠারোটা স্ক্রু দিয়ে আটকানো রয়েছে ওটা। একটা একটা করে খুলতে গেলে অনেক বেশি সময় লেগে যাবে, কাজেই খোলার চেষ্টা না করাই ভাল। তবে মিসাইলের সঙ্গে ওটাকে বিচ্ছিন্ন করার অন্য উপায়ও আছে। কেটে আলাদা করার জন্যেই ইলেকট্রিক করাতটা দেখতে পেয়ে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে রানা, কিন্তু তাতেও সময় অনেক বেশি লাগবে। কাটার কাজ শেষ করতে পারবে না, তার আগেই হয়তো বোতামে চাপ দিয়ে মিসাইল ছুঁড়বে ফাউলার।

পেন্সিল টর্চ জ্বেলে ওঅরহেডটাকে আরও খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল ও। ওটার মাথায় একটা কন্ট্রোল সিস্টেম আছে, কাচ দিয়ে মোড়া, ভেতরে লাল আর সবুজ কাঁটা- দুটোই স্থির হয়ে আছে। সম্ভবত কমপিউটর বা রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে অ্যাকটিভেট করা হয় কন্ট্রোল সিস্টেম, সঙ্গে সঙ্গে লাল কাঁটা জিরো পয়েন্টে চলে যায়, ধীর গতিতে সেটাকে অনুসরণ করে সবুজ কাঁটা। দ্বিতীয় কাঁটা লাল কাঁটার সঙ্গে এক হলে বিস্ফোরণের উপযোগী হয় ওঅরহেড।

মিসাইল ইতিমধ্যে আকাশে উঠে যায়, তারপর যখন টার্গেট আঘাত করে, তখনই বিস্ফোরিত হয় ওঅরহেড।

রানা দ্রুত চিন্তা করছে। সবচেয়ে ভাল হয় যদি মিসাইলটাকে অকেজো করতে পারে ও। কিন্তু ক্রুজ মিসাইলের মেকানিজম সম্পর্কে ওর কোনও ধারণা নেই। ওটা অ্যাকটিভেট করার জন্যে যে কমপিউটর বা রিমোট কন্ট্রোল ব্যবহার করা হবে তা-ও ওর নাগালের বাইরে। জানা কথা, জাহাজের ভেতর কোথাও ওগুলো আগলে বসে আছে খায়রুল কবির।

তাহলে? কিছুই কি করার নেই ওর? ইলেকট্রিক করাতটা কোন কাজেই লাগবে না? তারপর রানা ভাবল, আচ্ছা, ওঅরহেডের কন্ট্রোল সিস্টেম যদি ভেঙে ফেলা হয়? কন্ট্রোল সিস্টেম কাজ না করলেও কি ওঅরহেড বিস্ফোরিত হবে? হয়তো হবে না, হয়তো হবে। ওর জানা নেই।

চারদিকে আরেকবার চোখ বুলিয়ে কাউকে দেখল না রানা। নিজেকে আর চিন্তা করার সুযোগ না দিয়ে ইলেকট্রিক করাতটা চালু করল ও, ওঅরহেডের কন্ট্রোল সিস্টেমের ঢাকনিটা ভেঙে করাতটা তলার দিকে এমন ভাবে বসাল, যেন নিচে থেকে চেঁছে আলাদা করা যায়। কাজটা শেষ করতে মাত্র দেড় মিনিট লাগল। এত সহজে গোটা কন্ট্রোল সিস্টেম হাতে চলে আসায় সন্তুষ্ট হতে পারল না রানা। জায়গাটায় একটা গর্ত তৈরি হয়েছে, ভেতরে হাত গলিয়ে এক মুঠো তার ধরে হ্যাঁচকা টান দিল ও, ছিঁড়ে আনল সবগুলো।

কিন্তু সংশয় আর সন্দেহ তবু গেল না। আরেকবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে সংগ্রহ করা জিনিসগুলো থেকে তুলে নিল বড়

সাইজের একটা স্ক্রু-ড্রাইভার।

আঠারোটা স্ক্রু, প্রতিটি খুলতে দেড় মিনিট করে সময় লাগছে রানার। দ্বিতীয় একটা স্ক্রু-ড্রাইভার আর লীনা থাকলে কাজটা আরও তাড়াতাড়ি সারা যেত। কে জানে, ওরা হয়তো তাকে মেরেই ফেলেছে।

দশটা স্ক্রু খোলার পর বিপদের গন্ধ পেল রানা। দ্রুত হাত চালাল ও, বাকি আটটা পুরোপুরি না খুলে শুধু আলগা করে রাখল। যদি সময় পাওয়া যায়, ফিরে এসে শেষ করবে কাজটা। ওপরের প্ল্যাটফর্মে একটা ছায়ামূর্তিকে দেখতে পেয়েছে ও।

নিঃশব্দ পায়ে মই বেয়ে উঠল রানা। একটু আগেও কেউ একজন ছিল এখানে, এখন নেই। একবার ভাবল, আবার টিউবটার কাছে ফিরে যায়। কিন্তু হাতে আরও কাজ আছে, সেগুলোও কম জরুরী নয়। সংগ্রহ করা জিনিসগুলো এক জায়গায় জড়ো করল ও- একটা ডাক্ট টেপ, ইলেকট্রিক করাত, স্প্রে পেইন্ট ক্যান, গ্যাসোলিন ভরা একটা মেটাল ক্যানিস্টার। স্ক্রু-ড্রাইভারটা মিসাইলের কাছে রেখে এসেছে। কয়েক টুকরো টেপ ছিঁড়ল ও, গ্যাসোলিনের ক্যানটাকে ওগুলো দিয়ে মুড়ছে। উঁকি দিয়ে আরেকবার নিচে তাকাল, ক্যাটওয়াক ধরে মিসাইলের দিকে এগোচ্ছে একজন ক্রু। সঙ্গে কোন অস্ত্র নেই।

সাব-মেশিন গান তুলে একটা মাত্র গুলি করল রানা, লক্ষ্যস্থির করল লোকটার পায়ের সামনে। ধাতব ক্যাটওয়াকে লেগে আরেক দিকে ছিটকে গেল বুলেট। ঠিক কি ঘটেছে বুঝতে পারেনি ক্রু। চারদিকে তাকিয়ে ইতস্তত ভঙ্গিতে আরও এক পা সামনে বাড়ল সে। আরেকটা গুলি করল রানা, এবার সেটা লাগল লোকটার বাম

পায়ের আধ ইঞ্চি দূরে। ঘুরল লোকটা, খিঁচে দৌড় দিল।

আরও দুই মিনিট নির্বিঘ্নে কাজ করার সময় পেল রানা।

ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সদর দফতরে 'ইমার্জেন্সী কন্ট্রোল রূম' খোলা হয়েছে। তিন বাহিনীর প্রধানের সঙ্গে এক সারিতে বসে রয়েছেন বিসিআই চীফ রাহাত খান, ওঁদের সামনে নৌ ও বিমান বাহিনীর কমিউনিকেশন অফিসাররা স্যাটেলাইট টেলিফোন ও ওয়্যায়েরলেসের মাধ্যমে সারাক্ষণ যোগাযোগ রাখছেন বাংলাদেশী গানবোট ডি-ফাইভ রুস্তম, একজোড়া মিগ আর ব্রিটিশ ফ্রিগেট এইচএমএস নরফোকের সঙ্গে।

রাহাত খানের সামনের ডেস্কে কয়েকটা ফোন রয়েছে, এই মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছেন তিনি। বাহিনী প্রধানরা তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন, তিনজনের চেহারাই থমথম করছে। বোঝা না গেলেও, রাহাত খানও অত্যন্ত নার্ভাস বোধ করছেন।

স্টাফ অফিসার রিপোর্ট করলেন, 'স্যার, ব্রিটিশ ফ্রিগেট থেকে রিপোর্ট আসছে, ওরা কোন শিপ দেখতে পাচ্ছে না। আমাদের গানবোট আর মিগ থেকেও বলা হচ্ছে, কোথাও কিছু নেই।'

'ঠিকই আছে,' ক্রেডলে রিসিভার রেখে দিয়ে রাহাত খান বললেন। 'অদৃশ্যই যখন, দেখতে পাবার কথা নয়।'

'স্যার, ব্রিটিশ ফ্রিগেটের ক্যাপটেন বলছেন, ওটাকে খোঁজার জন্যে আর কোন সময় তিনি দিতে পারবেন না। কারণ আশঙ্কা করছেন, যে-কোন মুহূর্তে আবার ফ্রিগেট লক্ষ্য করে মিসাইল ছোঁড়া হবে।'

‘আমাদের গানবোট ফ্রিগেটের চেয়ে এগিয়ে আছে,’ বললেন রাহাত খান। ‘ওরা কি বলছে?’

‘ওই একই কথা বলছে ওরা, স্যার। যে-কোন মুহূর্তে আবার মিসাইল আক্রমণের আশঙ্কা...’

‘সংশ্লিষ্ট সবাইকে নির্দেশ দিন,’ বললেন রাহাত খান, ‘কোন অবস্থাতেই পাল্টা মিসাইল ছোঁড়া যাবে না। অন্তত আমরা এখান থেকে অর্ডার না দেয়া পর্যন্ত।’ কেন পাল্টা আক্রমণ করা যাবে না তা তিনি তিন বাহিনীর প্রধানকে ইতিমধ্যে ব্যাখ্যা করেছেন, এই মুহূর্তে নতুন করে সে প্রসঙ্গে কিছু বললেন না।

সী ঈগলে রানা থাকতে পারে, কথাটা রাহাত খান ভুলতে রাজি নন।

‘কিন্তু, স্যার,’ স্টাফ অফিসার বললেন, ‘একটা ব্রিটিশ ফ্রিগেটকে আমরা আত্মরক্ষা করতে নিষেধ করতে পারি না!’

স্পারি, কারণ আমাদের অনুরোধে তারা আমাদেরকে সাহায্য করতে এসেছে, কাজেই আমাদের সুবিধে-অসুবিধে তাদেরকে বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে।’

‘কিন্তু কতক্ষণ, মি. খান?’ নৌ-বাহিনী প্রধান খানিকটা কঠিন সুরেই প্রশ্ন করলেন। ‘আপনার একজন মাত্র এজেন্টের প্রাণ কি এত বেশি মূল্যবান যে ঢাকা ধ্বংস হবার ঝুঁকি আমরা নিতে পারি?’

‘আমাদের গানবোট, মিগ বা ব্রিটিশ ফ্রিগেট সী ঈগলকে দেখতেই পাচ্ছে না,’ জবাব দিলেন রাহাত খান। ‘আর আমার এজেন্ট এই মুহূর্তে সী ঈগলে রয়েছে। এখন আপনারাই বলুন, ঢাকাকে রক্ষা করার সম্ভাবনা কার বেশি?’

বাহিনী প্রধানদের কেউই তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করলেন না।

ফাউলারের প্রাইভেট কোয়ার্টারে ইন্টারকম বেজে উঠল।

কিন্তু ফাউলার তাকিয়ে আছে কবিরের দিকে। কবির বিজয়ীর ভঙ্গিতে বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে হেলান দিল চেয়ারে, হাত দুটো ভাঁজ করল বুকে, দাঁত বের করে হাসল। ফাউলারের চোয়াল উঁচু হয়ে উঠল, দাঁতে দাঁত ঘষছে। 'মানে?' জানতে চাইল সে।

'আমার কাজ শেষ,' বলল কবির, কাজটা যেন পানির মত সহজ ছিল।

'গুড।'

ইন্টারকম এখনও বাজছে। রিসিভার তুলল ফাউলার। তাকে বলা হলো, জরুরী ও বিপজ্জনক একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, এখুনি তাকে একবার মিসাইল প্ল্যাটফর্মে আসতে হবে। সব কথা না শুনেই হুঙ্কার ছাড়ল ফাউলার, 'স্াইপার মানে? স্াইপার কোত্থেকে আসবে? ঠিক আছে, আমি আসছি।'

কবিরকে নিয়ে ওখানে পৌঁছুতেই দেখা গেল চারদিকে ছুটোছুটি করছে গার্ডরা। একজন ক্রু রিপোর্ট করল, 'বাইরে বেরুলেই কে যেন গুলি করছে, স্যার। লকগুলোর কাছে এগোতেই পারছি না।' মিসাইলের পাশের প্ল্যাটফর্মটা হাত তুলে দেখাল সে।

'লক? কিসের লক?' জানতে চাইল ফাউলার।

কবির ব্যাখ্যা করল, 'আমরা যখন সাগরে থাকি, লঞ্চ টিউব তালা দিয়ে রাখা হয়। লঞ্চিং মেকানিজম আনলক করা না হলে ওটা ছোঁড়া যাবে না।'

ফাউলারের চোখ সরু হয়ে গেল। দেয়াল থেকে ফোনের রিসিভার নিয়ে বললেন, ‘মেনাচিম! মেয়েটাকে নিয়ে এখুনি চলে এসো এখানে। মাসুদ রানা এখনও বেঁচে আছে।’ রিসিভার রেখে দিয়ে সবার দিকে চোখ গরম করে তাকাল। তারপর ভিড় ঠেলে প্ল্যাটফর্মে বেরিয়ে এল।

চারদিকে কোথাও কেউ নেই। ‘রানা?’ চিৎকার করে ডাকল। চেম্বারের ভেতর প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল তার গলা।

ফাউলারের পিছন থেকে উঁকি দিল রানা। এই ফাউলার ইস্পাতের তৈরি মূর্তি, ভারী একটা মেশিনের মাথার কাছে মাচায় দাঁড়িয়ে আছে। হাতের অস্ত্রটা রক্ত-মাংসের প্রতিপক্ষের দিকে তাক করল ও।

‘আমাকে আপনি গুলি করবেন না, মি. রানা। মেয়েটা আমার হাতে, আপনি জানেন। আমাকে আপনি মেরে ফেললে মেনাচিম মেয়েটাকে সত্যি সত্যিই চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে, জ্যান্ত অবস্থায়, বিলিভ মি। কাজেই ধরা দিন।’

রানা কথা বলছে না।

‘খবরটা লেখা হয়ে গেছে, মি. রানা। প্রেসে পাঠিয়েও দিয়েছি। আজ রাতে নতুন কোন সংস্করণ বের হবে না। আপনি আত্মসমর্পণ করলে, কথা দিচ্ছি আপনাকে বা মেয়েটাকে মেনাচিম টরচার করবে না। বিসিআই আর ঢাকার অস্তিত্ব না থাকলে আপনার বিষও ঝরে যাবে, তখন আপনি একটা ঢোঁড়া সাপে পরিণত হবেন, কাজেই আপনাকে ছেড়ে দিতেও পারি আমি।’

রানা জবাব দিল ক্যাটওয়াকে এক পশলা গুলি করে। আঁতকে উঠে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হলো ফাউলার।

স্টার্ন প্ল্যাটফর্ম থেকে ভারী একটা মেশিনারি আগেই দেখে রেখেছিল রানা, সেটার মাথায় উঠে স্াইপারের ভূমিকা নিয়েছে। মেশিনটা এত উঁচু, এখান থেকে সী ঈলের মাথার নাগাল পেতে পারে। আগেই একটা কনট্র্যাপশন তৈরি করে রেখেছে, ডাক্ট টেপ দিয়ে সেটা খোলের ভেতরের সারফেসে আটকাল, তারপর নিচে নামতে শুরু করল। নিচের ক্যাটওয়াকে একটা শব্দ হতে দাঁড়িয়ে পড়ল, পরমুহূর্তে লাফ দিয়ে নিজের স্াইপার পজিশনে ফিরে এল, হাত তুলল গুলি করার জন্যে।

ক্যাটওয়াকে লীনা! হ্যান্ডকাফ পরা হাত দুটো সামনে, ওটা থেকে একটা লোহার শিকল নেমে এসেছে পায়ের গোড়ালিতে। পিছনে মেনাচিম, লীনাকে বর্ম হিসেবে ব্যবহার করছে।

‘গুলি করো! গুলি করো!’ চিৎকার করছে লীনা। ‘ওরা আমাকে এমনিতেও মেরে ফেলবে!’

পরিস্থিতিটা বিবেচনা করছে রানা। সিলিঙে রেখে আসা কনট্র্যাপশনটার দিকে আড়চোখে তাকাল একবার। রেইলিং থেকে কতটা দূরে রয়েছে ও, সেটাও আন্দাজ করল। তারপর দেখে নিল লীনাই বা রেইলিং থেকে কত দূরে। চীনা ভাষায় কিছু একটা বলল ও, লীনার উদ্দেশে।

ফরওয়ার্ড প্ল্যাটফর্ম থেকে রানার চিৎকার শুনতে পেল ফাউলার, দাঁতে দাঁত ঘষল। ‘মেনাচিম! সাবধান! কিছু একটা করতে যাচ্ছে...’

হাতের অস্ত্রটা ওপর দিকে তুলল রানা, চীনা ভাষায় গুনছে, ‘এক...দুই...তিন...’

সিলিণ্ডে রেখে আসা হাতে তৈরি বোমায় গুলি করল রানা। কান ফাটানো আওয়াজ হলো, বিস্ফোরণের ফলে খোলের বাইরের একটা অংশও উড়ে গেছে। একই মুহূর্তে নিজের পজিশন থেকে নিখুঁত ডাইভ দিল রানা, পড়ল দুই পনটুনের ঠিক মাঝখানের পানিতে। লীনাও দেরি করেনি। বিস্ফোরণ ঘটায় মেনাচিম হতভম্ব, সেই সুযোগে সে-ও ক্যাটওয়াকের রেইলিং লক্ষ্য করে লাফ দিয়েছে। কিন্তু মেনাচিম অসম্ভব ক্ষিপ্র বেগে হাত বাড়াল। রেইলিং টপকে নেমে যাচ্ছে লীনা, তার গোড়ালিতে জড়ানো চেইনটা খপ করে ধরে ফেলল সে। তারপর ধীরে ধীরে রেইলিং থেকে নামিয়ে আনল ক্যাটওয়াকে।

গার্ডরা গুলি করছে রানাকে। পানির আরও গভীরে নেমে যাচ্ছে রানা, ওর চারধারের পানিতে আঘাত করছে বুলেটগুলো। দ্রুত সাঁতার কেটে সী ঈলের নিচ থেকে বেরিয়ে এল ও। পানির ওপর মাথা তুলে বুক ভরে বাতাস নিয়ে দ্রুত চোখ বুলাল চারদিকে। লীনাকে কোথাও দেখতে না পেয়ে হতাশায় ছেয়ে গেল মনটা। এখন উপায়? লীনাকে ফেলে যাওয়া ওর পক্ষে সম্ভব নয়।

বোটটার দিকে আবার এগোল রানা।

ঢাকা, বাংলাদেশ। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের 'ইমার্জেন্সী কন্ট্রোল রুম'। গানবোট থেকে নতুন একটা রিপোর্ট আসছে। স্টাফ অফিসার স্যাটেলাইট ফোনের রিসিভার নামিয়ে রেখে তিন বাহিনী প্রধান ও বিসিআই চীফের দিকে ফিরলেন। 'গানবোটের রিপোর্ট, স্যার,' বললেন তিনি। 'ওদের রেডারে একটা টার্গেট ধরা পড়েছে। বেয়ারিং ওয়ান ওয়ান টু ডিগ্রী। অত্যন্ত দুর্বল সিগনাল, সঠিক রেঞ্জ

বোঝা যাচ্ছে না। তবে গানবোটের ক্যাপটেন শপথ করে বলছেন, এক সেকেন্ড আগেও ওটা ওখানে ছিল না।’

‘টার্গেটের আকৃতি সম্পর্কে কিছু জানা যাচ্ছে না?’ জানতে চাইলেন নৌ-বাহিনী প্রধান।

‘ক্যাপটেন বলছেন, এক ধরনের জলযানই হবে।’

নৌ-বাহিনী প্রধান কিছু বলবেন বলে মনে হলো, তার আগেই বিসিআই চীফ বলে উঠলেন, ‘ব্রিটিশ ফ্রিগেট, আমাদের মিগ আর আমাদের গানবোটকে নির্দেশ দিন- ডু নট ফায়ার। রিপিট, ডু নট ফায়ার। গানবোট আর ফ্রিগেটকে বলুন, স্পীড দশ নটে নামিয়ে আনতে হবে।’

তিন বাহিনী প্রধান পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলেন, তবে এবারও তাঁরা কোন কথা বললেন না। বিসিআই চীফ রাহাত খানকে তাঁরা খুব ভালভাবে চেনেন, তাঁর ওপর তাঁদের আস্থা আছে।

ফাউলার আর কবির ক্যাটওয়াক ধরে ছুটে এসে সী ঈলের মাথার দিকে তাকাল। সিলিঙে তৈরি ফাঁকটার বাইরে কয়েকটা তারাকে মিটমিট করতে দেখা গেল। ‘খোল ভেঙে গেছে,’ বিড়বিড় করল কবির। ‘যে-কোন রেডার এখন আমাদেরকে দেখতে পাবে।’

কবিরের কথা শুনে মাথাটা ঘুরে উঠল, ছুটে ফরওয়ার্ড প্ল্যাটফর্মে বেরিয়ে এল ফাউলার, রাগে কাঁপছে। ‘মেনাচিম! যে-ক’জন লোক লাগে, সবাইকে নিয়ে ফাঁকটা আগে বন্ধ করো, তারপর অন্য কাজ!’ লীনাকে ধরে থাকা গার্ডদের দিকে ফিরল। ‘সাগরে ফেলে দাও ওকে। কোন ঝুঁকি নেবে না। আগে গুলি

করবে।'

ক্যাটওয়াকে ফিরে এসে ইন্টারকমে নির্দেশ দিল, 'ক্যাপটেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই জায়গা ছেড়ে সরে যান!'

একজন গার্ড হাতের অস্ত্র তুলে লীনার মাথায় ঠেকাল। দেখতে পেয়ে ফাউলার দাঁতে দাঁত চাপল। 'এখানে নয়, হারামীর বাচ্চা! বটম লেভেলে নিয়ে যা!'

লীনার হ্যান্ডকাফ ধরে হ্যাঁচকা টান দিল গার্ড, তারপর ঠেলে দিল সিঁড়ির দিকে।

কবিরকে ইঙ্গিত দিলেন ফাউলার, 'আসুন!' ক্যাটওয়াক থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

*

ঢাকা, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের 'ইমার্জেন্সী কন্ট্রোল রুম'। বাংলাদেশী গানবোট আর ব্রিটিশ ফ্রিগেট থেকে আরেকটা রিপোর্ট এসেছে। রেডারে ক্ষীণ যে টার্গেট ধরা পড়েছে সেটা যে ম্যাডক ফাউলারের সী ঈল, এ-ব্যাপারে তাঁরা এখন প্রায় নিশ্চিত। স্টাফ অফিসার বললেন, 'আমাদের গানবোটের মিসাইল রেঞ্জের মধ্যে এখনও ওটাকে পাচ্ছে না, তবে কিছুক্ষণের মধ্যে পেয়ে যাবে।'

'আর ব্রিটিশ ফ্রিগেট?' জানতে চাইলেন নৌ-বাহিনী প্রধান।

'ওরা এখুনি মিসাইল ছুঁড়তে পারে, রেঞ্জের মধ্যে পেয়ে যাবে,' স্টাফ অফিসার জানালেন।

এবার তিন বাহিনী প্রধানই বিসিআই চীফ রাহাত খানের দিকে তাকালেন তাঁর মতামত শোনার জন্যে। এক সেকেন্ড চিন্তা করে ডেস্ক থেকে লাল টেলিফোনের রিসিভার তুললেন রাহাত খান, কথা বললেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে।

ত্রিশ সেকেন্ড কথা হলো। রিসিভারটা ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখলেন বিসিআই চীফ। সবাই অপেক্ষা করছেন তিনি কি বলেন শোনার জন্যে।

‘গানবোটের ক্যাপটেনকে নির্দেশ দিন,’ স্টাফ অফিসারকে বললেন রাহাত খান। ‘রেঞ্জের মধ্যে পাওয়া মাত্র তিনি যেন মিসাইল ছুঁড়ে সী ঈলকে ডুবিয়ে দেন। ব্রিটিশ ফ্রিগেটকে নির্দেশ দিন, তারা যেন কোন মিসাইল না ছোঁড়ে।’

তিন বাহিনী প্রধানের চেহারায় পরিষ্কার স্বস্তির ছাপ ফুটল।

কিন্তু রাহাত খান পাথর হয়ে গেছেন। মনে মনে জানেন, নির্দেশটা দিয়ে তিনি তাঁর প্রাণপ্রিয় সন্তানতুল্য মাসুদ রানার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছেন।

কবিরকে নিয়ে সী ঈলের ব্রিজে উঠে এল ফাউলার। ক্যাপটেন সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট করল, ‘ব্রিটিশ ফ্রিগেট স্পীড কমিয়ে দিয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশী গানবোট এগিয়ে এসেছে। দূরত্ব মাত্র দশ মাইল।’

‘আমাদের রেডার টেকনলজির মাহাত্ম্য তো এখানেই,’ বলল কবির। ‘ফাঁকটা বন্ধ হওয়া মাত্র ওরা আমাদেরকে দেখতে পাবে না।’

একটা ৪.৫ ইঞ্চি স্টার শেল বিস্ফোরিত হলো সী ঈলের মাথা থেকে অনেকটা ওপরে। ফ্লেয়ার গানের একটা শট-এর মত, তবে হাজার গুণ বেশি শক্তিশালী।

কবির মন্তব্য করল, ‘ব্রিটিশ ফ্রিগেট পিছিয়ে পড়লেও, স্টার শেল ছুঁড়ে বাংলাদেশী গানবোটকে সাহায্য করছে ওরা।’

খেপে গিয়ে ক্যাপটেনকে নির্দেশ দিল ফাউলার, 'মিসাইল ছুঁড়ুন! মিসাইল ছুঁড়ুন!'

'টার্গেট ব্রিটিশ ফ্রিগেট, স্যার?' ক্যাপটেন হতভম্ব।

'আবার জিজ্ঞেস করে! একবার তো বললাম!' গর্জে উঠল ফাউলার।

বিকট একটা বিস্ফোরণ সী ঈলকে কাঁপিয়ে দিল। গানবোটের রেডারে যেহেতু এখন সী ঈল দেখা যাচ্ছে, ওটা থেকে এখন হাই এক্সপ্লোসিভ শেল ছুঁড়ছে গানাররা।

চোখ ধাঁধানো সাদা আলোয় সী ঈলকে এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এমনকি রানাও সী ঈলের প্রকাণ্ড আকৃতি দেখে বিস্মিত না হয়ে পারল না। আলো থাকায় বোটে আরও দ্রুত উঠতে পারছে ও।

সী ঈল পালাচ্ছে না, ফুল স্পীডে এঁকেবেঁকে সামনের দিকেই ছুটছে। ফাউলারের ক্রুরা শর্ট রেঞ্জের মিসাইল ছুঁড়তে অভ্যস্ত হলেও, আগে কখনও ক্রুজ মিসাইল ছোঁড়েনি। ওঅরহেড ফিট করা কোন মিসাইল ছোঁড়ার অভিজ্ঞতাও তাদের নেই। ফাউলারকে আগেই তারা জানিয়ে দিয়েছে, সী ঈল টার্গেটের খুব কাছাকাছি না পৌঁছুনো পর্যন্ত ক্রুজ মিসাইল ছুঁড়ে কোন লাভ নেই। অন্তত তারা কোন নিশ্চয়তা দিতে পারবে না যে টার্গেটে ওটা আঘাত হানবে।

সী ঈলের মাথায় তৈরি ফাঁকটার ওপর চোখ রেখে ওপরে উঠছে রানা। এই সময় সী ঈলের ঠিক পিছনের পানিতে একটা শেল বিস্ফোরিত হলো। মস্ত একটা ঢেউ ছুটে এসে আছড়ে পড়ল ওর গায়ে। এক মিনিট পর আলোর এক জোড়া ঝলক ছুটে গেল-

সী ঈলের পনটুন থেকে দুটো অ্যান্টি-শিপ মিসাইল ছোঁড়া হয়েছে। এক মুহূর্ত পর ঝট করে মাথা নিচু করল রানা, সরাসরি ওর মাথার ওপর দিয়ে আরও দুটো মিসাইল ছুটে গেল।

ম্যাডক ফাউলার যে সত্যিই বদ্ধ এক উন্মাদ, এখন আর তাতে কোন সন্দেহ নেই। বাংলাদেশী গানবোটকে নয়, সী ঈলের ক্রুরা ব্রিটিশ ফ্রিগেটকে লক্ষ্য করে মিসাইল ছুঁড়ছে। কিংবা হয়তো টার্গেট প্র্যাকটিসের জন্যে সরাসরি ঢাকার দিকে। ব্যাপারটা রানা ধরতে পারল মিসাইলগুলোর যাত্রা পথ লক্ষ করে। বাংলাদেশী গানবোট বা ব্রিটিশ ফ্রিগেট খুব বেশি হলে সী ঈলের কাছ থেকে দশ থেকে পনেরো মাইল দূরে আছে। কিন্তু মিসাইলগুলো এত দূরের পথ পাড়ি দিচ্ছে, যেন তিনশো বা সাড়ে তিনশো মাইল দূরের কোন টার্গেটে আঘাত হানবে।

এগারো

ক্যাটওয়াক ধরে ধীর পায়ে হাঁটছে লীনা, পিছু নিয়ে আসছে দু'জন সশস্ত্র গার্ড। বটম লেভেল আর বেশি দূরে নয়, ওখানেই তাকে গুলি করে ফেলে দেয়া হবে সাগরে। পায়ে শেকল বাঁধা, প্যাঁচানো সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় হোঁচট খেলো সে, গড়িয়ে খোলা একটা চত্বরে পড়ে গেল।

সিঁড়ির গোড়ায় পড়ে থাকল লীনা, গোঙাচ্ছে। গার্ড দু'জন পরস্পরের দিকে তাকাল। মেয়েটা কি আহত হয়েছে? একজন সাহায্য করতে এগিয়ে এল, কিন্তু অপর লোকটা বাধা দিল তাকে, তারপর লীনার মাথার ঠিক পাশে একটা গুলি করল। 'ওঠো!' খেঁকিয়ে উঠল সে।

টলতে টলতে সিধে হলো লীনা। তবে কৌশলটায় কাজ হয়েছে। সে তার ডান কান থেকে লকপিক ইয়ারিংটা খুলতে পেরেছে।

বড়সড় মেশিনটার মাথায় কয়েকজন ক্রুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে

মেনাচিম, রানার তৈরি ফাঁকটার কাছাকাছি। নিচের প্ল্যাটফর্ম থেকে মেরামতের সরঞ্জাম এসে পৌঁছাচ্ছে। ফাঁকটার দিকে তাকিয়ে ছিল মেনাচিম, হঠাৎ সেখানে রানার মুখ দেখে হতভম্ব হয়ে পড়ল। মেনাচিমের মত রানাও চমকে গেছে।

নিজেকে দ্রুত সামলে নিয়ে পায়ের কাছে মেঝেতে ফেলে রাখা সাব-মেশিনগানটা তুলল মেনাচিম, কিন্তু ততক্ষণে ফাঁক থেকে অদৃশ্য হয়েছে রানার মুখ। 'আমি বেরিয়ে গেলে ফাঁকটা সীল করে দাও!' ক্রুদের নির্দেশ দিল সে। ক্রল করে এগোল, ফাঁক গলে পিছু নিল রানার।

বাইরে মেনাচিমের জন্যে অপেক্ষা করছে রানা। সিলিংটার ফাঁক গলে মেনাচিমের শরীর অর্ধেকটা বেরিয়ে এসেছে, ছুটে এসে তার বুকে দুই পা দিয়ে পড়ল ও। শব্দ করে ভেঙে গেল কয়েকটা পাঁজর, ফাঁকের তীক্ষ্ণ কিনারা মাংস ভেদ করে হাড়ে গিয়ে ঠেকল।

সরে এসে তাকাল রানা, অন্ধকারে আঘাতের মাত্রা বোঝা গেল না। সাগরের গর্জন ছাড়া কানেও কিছু ঢুকছে না।

এই সময় নতুন আরেকটা স্টার শেল বিস্ফোরিত হলো মাথার ওপর। সরে আসছে রানা, জার্মান স্যাডিস্টের গোঙানি শুনতে পেল। হাঁ হয়ে গেল রানা, খোলের ধারাল ধাতব পাত গেঁথে আছে শরীরে, সেগুলো থেকে ধীরে ধীরে নিজেকে মুক্ত করছে মেনাচিম। রানার বিস্ময় বাধ মানল না, কারণ এত যন্ত্রণার মধ্যেও হাসছে লোকটা। নিজেকে মুক্ত করেই শরীরটায় ঝাঁকি দিয়ে ফাঁক থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে এল সে প্রায় অনায়াসে। পিঠে একটা হাত বুলাল, রক্তে ভিজে গেল সেটা, মুখের সামনে তুলে ঠোঁট আর জিভ দিয়ে চাটছে। 'ভেবেছেন আমি শেষ হয়ে গেছি?' মুখে রক্ত

নিয়ে রানাকে বলল সে। 'খেল তো সবে শুরু হলো!'

দুই পা ছুটে এসে মেনাচিমের মুখে লাথি মারল রানা। কোন প্রতিক্রিয়া নেই, আঘাতটা নীরবে সহ্য করল মেনাচিম। তবে রানার গোড়ালিটা ধরে ফেলেছে, ধরেই ঠেলে দিল ওপর দিকে, ছিটকে দ্রুতগতি বোটের ডেকে এসে পড়ল রানা। অকস্মাৎ কাছাকাছি বিস্ফোরিত হলো একটা শেল, দু'জনের গায়েই ঝরে পড়ল এক রাশ আবর্জনা। 'শেষ হতেও বেশি সময় নেবে না,' কোন রকমে বলতে পারল রানা।

লোয়ার ওঅর্ক প্ল্যাটফর্মের রেইলিংটা সামনে, দু'জন গার্ড লীনাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে সেদিকে। খোলের নিচে দুই পনটুনের মাঝখানে সাগর ফুঁসছে। লীনার মাথার পিছনে গুলি করার জন্যে একজন গার্ড হাতের পিস্তলটা তুলল।

রেইলিঙের সামনে এসে দাঁড়াল লীনা, তারপর পিছিয়ে এল গার্ডদের দিকে। একজন হাত তুলল, পিঠে ধাক্কা দেবে। কিন্তু মুহূর্তে দুই গার্ডের মাঝখানে সেঁধিয়ে গেল লীনা, দুই হাতে দু'জনের মাথা ধরে প্রচণ্ড জোরে পরস্পরের সঙ্গে ঠুকে দিল। দু'জনেই চেঁচিয়ে উঠল ব্যথায়, এই সুযোগে ওদের একটা করে হাত এক করে নিজের হ্যান্ডকাফটা পরিয়ে দিল। কি ঘটছে বুঝতে পারার আগেই ধাক্কা দিয়ে গার্ডদের রেইলিঙের ওপাশে ফেলে দিল সে।

খোলা ডেক থেকে একটা করিডরে চলে এল লীনা, হাতে এক জোড়া সাব-মেশিনগান।

স্টার্ন ওঅর্ক প্ল্যাটফর্মে ক্রুরা চার ফুট লম্বা ও দুই ফুট চওড়া একটা ফ্রেম বসিয়ে খোলের ফাঁকটা বন্ধ করে দিল। রেডার প্রুফ কালো কমপজিট ম্যাটেরিয়াল-এর প্রলেপ দেয়া আছে, ফলে সী ঈলের বাকি অংশের মত এই তালি দেয়া অংশটুকুও রেডারে ধরা পড়বে না। নিজের অফিস থেকে মনিটরে সবই দেখছে ফাউলার। তার পাশে দাঁড়িয়ে ফ্রেঞ্চকাট দাড়িতে হাত বুলাচ্ছে কবির, ফিক ফিক করে হাসছে।

গানবোটের ক্যাপটেনকে একজন অফিসার রিপোর্ট করল, 'স্যার, টার্গেটটা আমরা হারিয়ে ফেলেছি! রেডারে এখন কিছুই নেই।'

ক্যাপটেন মনিটরের দিকে তাকালেন। স্ক্রীনে সত্যি কোন ব্লিপ নেই। 'আশ্চর্য!' বিড় বিড় করলেন তিনি। 'তবে দেখা না গেলেও আছে সামনেই। গানবোটের স্পীড আরও বাড়িয়ে দিন।'

মেনাচিমের সঙ্গে লড়াইয়ে রানা জিততে পারছে না। প্রায় অনায়াস ভঙ্গিতে রানাকে মাথার ওপর তুলে ছুঁড়ে দিল সে, খোলের গায়ে ভারী বস্তার মত পড়ল ও। তবে মেনাচিম ছুটে এসে লাথি মারতে শরীরটাকে গড়িয়ে দিয়ে সরে যেতে পারল। জিততে না পারলেও, প্রাণপণে লড়ছে রানা। দু'একটা মার এমন প্রচণ্ড ব্যথা দিচ্ছে মেনাচিমকে, অন্য কোন লোক হলে জ্ঞান তো হারাতই, মারাও যেতে পারত। কিন্তু মেনাচিমের কিছুই হচ্ছে না। হাল ছাড়ার কোন লক্ষণ নেই তার মধ্যে। এতটুকু ক্লান্তও হচ্ছে না। এক পর্যায়ে রানার মুখে পরপর কয়েকটা ঘুসি মারল সে। কপাল ফুলে গেল রানার, আচ্ছন্ন বোধ করল, পিছাতে শুরু করে পড়েই যাচ্ছিল।

কোত্থেকে শক্তি পেল কে জানে, শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে লাফ দিল সামনে, ডান হাতের কোপ মারল মেনাচিমের গলায়। খুনীটা হেসে উঠে পা বাড়াল সামনে।

পিছিয়ে এসেছিল রানা, আবার লাফ দিল। এবার তৈরি ছিল মেনাচিম। লাফ দিয়েছে রানা, কিন্তু এখনও মেনাচিমকে নাগালের মধ্যে পায়নি, তার আগেই পা ছুঁড়ল খুনীটা।

লাথিটা রানার পেটে লাগল। কুঁজো হয়ে গেল ও। ছুটে এসে দুই হাত দিয়ে ধাক্কা মারল মেনাচিম। রেইলিং টপকে সী ঈল থেকে নিচে পড়ে গেল রানা।

আধখানা চাঁদের দিকে মুখ তুলে নিজের বুকে দমাদম ঘুসি মারল মেনাচিম। আত্মপীড়ন তার সারা শরীরে পুলক জাগিয়ে তুলল। কিনারা থেকে নিচে উঁকি দিল সে, দেখল বোটের একটা পাশ ধরে কোন রকমে ঝুলে রয়েছে রানা, তার কাছ থেকে ছয় ফুট নিচে। পা দুটো পানি ছুঁই ছুঁই করছে। শেষ স্টার শেলের আলোয় দৃশ্যটা পরিষ্কারই দেখা গেল।

সী ঈলের অ্যান্টিসেপটিক টারবাইন রূমে ঢুকে পড়ল লীনা, ভেতরে দৈত্যাকার একজোড়া স্টীম টারবাইন রয়েছে। প্রতিটি টারবাইনে মোটা কয়েকটা পাইপ ঢুকেছে, প্রতিটি পাইপের প্রেশার মাপছে কাঁচ-মোড়া প্রেশার ডায়াল। ভেতরে ঢুকেই এক পশলা গুলি করল লীনা, দূর প্রান্তের দরজা দিয়ে পড়িমরি করে ছুটে পালাল দু'জন গার্ড। দুই দরজার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে টারবাইনগুলোর দিকে এগোল সে। লক্ষ করল, ওগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করছে এক সারি ডায়াল আর ভালব, সবগুলো সংশ্লিষ্ট টারবাইনের

পাইপের গায়ে বসানো। একটা করে পাইপ ধরে এগোল লীনা, একটা করে ভালব ঘুরিয়ে দিল। প্রেশার গজের কাঁটা রেড জোনের দিকে উঠে যাচ্ছে।

কাজটা প্রায় শেষ করে ফেলেছে লীনা, দ্বিতীয় দরজা দিয়ে আটজন গার্ড ভেতরে ঢুকল, পরস্পরকে কাভার দিচ্ছে। লীনা কি করছে না করছে সেদিকে তাদের খেয়াল থাকল না। টারবাইনের কাছাকাছি চলে এসেছে তারা, এক পশলা গুলি করল লীনা। অকস্মাৎ প্রথম সাব-মেশিনগানের ম্যাগাজিন খালি হয়ে গেল। দ্বিতীয়টার ক্লিপ চেক করল সে, আর মাত্র দুটো বুলেট আছে।

এই শেষ বুলেট দুটো একজোড়া পাইপের ভালবে ব্যবহার করল লীনা, তারপর লাফ দিল সামনের দিকে। ভালব দুটো বিস্ফোরিত হলো, শুরু হলো চেইন রিয়্যাকশন। বাকি ভালব-গুলোও বিস্ফোরিত হলো, সুপার-হিটেড স্টীমে ভরাট হয়ে গেল কামরা। গরম বাষ্প পরিষ্কার হতে এক মিনিট সময় লাগল। আগেই দরজার বাইরে বেরিয়ে এসেছে লীনা, তা না হলে সেদ্ধ হয়ে যেত। আটজন গার্ডকে টারবাইনগুলোর কাছাকাছি পড়ে থাকতে দেখল সে, নিষ্প্রাণ ভেজা শরীর থেকে এখনও ধোঁয়া উঠছে।

লোয়ার ওঅর্ক প্লাটফর্মে চলে এল লীনা, সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে।

ফাউলার ও কবির অনুভব করল সী ঈলের গতি কমে যাচ্ছে।

'টারবাইনে কোন প্রেশার নেই, দুটোতেই,' প্রোপালশন কন্ট্রোল পরীক্ষা করে বলল ক্যাপটেন। স্পানিতে আমরা অচল

হয়ে পড়ছি।’

‘আমাদের জন্যে খারাপ খবর, তবে আরও ভয়াবহ বাংলাদেশের জন্যে। যত তাড়াতাড়ি পারা যায় স্টীম ফিরিয়ে আনুন,’ নির্দেশ দিল ফাউলার। কবিরের দিকে ফিরল সে। ‘যেহেতু অচল হয়ে পড়েছি, ক্রুজ মিসাইলটা এবার ঢাকায় পাঠানো যেতে পারে।’

ওপরে উঠতে না পেরে এখনও বোটের গায়ে ঝুলছে রানা। জাহাজটা স্থির হয়ে পড়ায় ঝুলে থাকতে এখন তেমন কষ্ট হচ্ছে না। কিন্তু ওর কাছে নেমে আসতে মেনাচিমেরও কোন অসুবিধে হচ্ছে না।

রানার বাম দিকে, বারো ফুট দূরে, একপাশে সরে গেল মিসাইল লঞ্চ ডোর। সেদিকে এগোল ও, মেনাচিমও পিছু নিল ওর।

ভেতরে লাফ দিল রানা, দরজা থেকে কিছুটা ঝুলে কিছুটা খসে ক্যাটওয়াকে পড়ল, খানিকটা গড়িয়ে সিধে হলো একটা হাঁটুর ওপর। ওর ওপরে ছোট একটা প্যানেল, মিসাইল ডোর-এর ঠিক নিচে, তাতে সবুজ আর লাল বড় দুটো বোতাম। প্যানেলের গায়ে লেখা- ‘ইমার্জেন্সী ক্লোজঢ়ওপেন’। লাল বোতামটার দিকে হাত লম্বা করল রানা, কিন্তু দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে ওর গায়ে আছড়ে পড়ল মেনাচিম। ক্যাটওয়াক থেকে নিচে পড়ে গেল রানা।

পড়ল খোলা জায়গায়, সরাসরি নিচে সাগর। ক্রুজ মিসাইল লঞ্চ টিউবটা কোনরকমে ধরে ফেলল। আগেই দেখেছে টিউবটা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে সাপোর্ট বা অবলম্বনের ওপর ভারসাম্য রক্ষা

করছে। সাপোর্টগুলো খোলা জায়গাটার ওপর ঝুলে আছে। সামনে, ওঅরহেডের দিকে, চাপ পড়ায় ধীরে ধীরে নিচু হতে শুরু করল সাপোর্ট। তারপর দেখা গেল মিসাইলের মাথায় ওঅরহেডটা সরাসরি পানির দিকে তাক করে রয়েছে, শেষ মাথায় ঝুলছে রানা।

মিসাইল প্রোগ্রামিং এরিয়ায় বসে রয়েছে কবির, পিছনে তিনজন গার্ড। কী বোর্ড টেপাটেপির কাজ শেষ করল সে, চোখ তুলে মনিটরের দিকে তাকাল। 'প্রস্তুতি শেষ,' বলল সে। 'যখন খুশি ফায়ার করতে পারেন আপনি।'

প্রাইভেট কোয়ার্টারে বসে মনিটরে কবিরকে দেখতে পাচ্ছে ফাউলার, সেই সঙ্গে দেখতে পাচ্ছে কবির যে কামরায় বসে আছে তার বেশিরভাগ অংশ। মনিটরে তাকিয়ে আছে, দেখতে পেল কবিরের পিছনে উদয় হলো লীনা। 'সরি, ডার্লিং,' মাইক্রোফোনে বলল ফাউলার। 'অনেক দেরি করে ফেলেছ।'

কবির হতভম্ব। 'কি? ডার্লিং?' ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাতেই লীনাকে দেখতে পেল সে। তিনজন বডিগার্ড একযোগে যে যার অস্ত্রের দিকে হাত বাড়াল, কিন্তু তার আগেই লীনার শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। শূন্যে লাফ দিল সে, জোড়া পায়ের লাথি মারল প্রথম গার্ডের বুকে। মেঝেতে নামল, কনুই চালিয়ে দ্বিতীয় গার্ডের ডান চোখ কানা করে দিল। তৃতীয় গার্ডের চুল খামচে ধরে মাথাটা নিচু করল, ভাঁজ করা হাঁটু দিয়ে থেঁতলে দিল মুখটা। তিনজনই জ্ঞান হারিয়েছে। কবিরের দিকে তাকাল সে, বলল, 'কি ভাই, দেশের সঙ্গে বেঈমানী?'

কবিরের চোয়াল ঝুলে পড়ল, ধীরে ধীরে মাথার ওপর হাত

তুলল সে।

লাফ দিয়ে লঞ্চ টিউবের লেজে উঠে পড়ল মেনাচিম। ভারসাম্য বিঘ্ন ঘটায় মিসাইলের সামনের দিক উঁচু হলো, রানাকে নিয়ে। মেনাচিমের প্রান্ত ডেবে গেল নিচের দিকে। মিসাইলের লেজের দিকটাও সাগরের ওপর ঝুলে আছে। একবার রানার দিকটা নিচু হয়, একবার মেনাচিমের দিক। খুব ঘন ঘন ওঠা-নামা করছে, ফলে মেনাচিমের পক্ষে লেজের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হলো না, সে-ও রানার মত ঝুলে পড়ল। সময় বুঝে নিজের প্রান্তটা ছেড়ে দিল রানা, মিসাইল থেকে খসে পড়ল নিচের মিসাইল ডোরে, পড়েই এক লাফে সিধে হলো।

লঞ্চ টিউবের লেজের দিকটা দ্রুত নিচু হতে শুরু করল, তবে মেনাচিম খপ করে লোয়ার ক্যাটওয়াকের রেইলিংটা ধরে ফেলায় টিউবের ওঠা-নামা বন্ধ হয়ে গেল।

তারপর হঠাৎই মিসাইল প্রোগ্রামিং রূমের দরজা বিস্ফোরিত হলো, ফরওয়ার্ড প্ল্যাটফর্মে বেরিয়ে এল কবির, পিছনে লীনা। কবিরকে ঠেলে রেইলিঙের দিকে নিয়ে আসছে সে।

'বললাম তো, হার মানছি!' চিৎকার করছে কবির। 'কি করব, ফাউলার আমার কথা শুনলেন না!'

পিছন থেকে প্রচণ্ড এক ধাক্কা দিল লীনা, রেইলিং টপকে পানিতে পড়ল কবির। লীনার খেয়াল নেই, পনটুনের সঙ্গে বাঁধা আছে পাশাপাশি তিনটে স্রকেল। ভুল করে কবিরকে পালাবার সুযোগ করে দিয়েছে সে।

নিজের ডেস্ক থেকে মনিটরে ফাউলার দেখল শূন্যে ঝুলছে

মেনাচিম, ধরে আছে ক্রুজ মিসাইল লঞ্চারের পিছনটা, গোড়ালি আটকে আছে লোয়ার পোর্টসাইড ক্যাটওয়াকে। এই দুই পয়েন্টের মাঝখানে বিস্তৃত হয়ে আছে তার শরীর, নড়াচড়ার সুযোগ নেই।

মেনাচিমের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, মিসাইল লঞ্চ ডোর-এর সরাসরি সামনে ঝুলছে সে।

লাউডস্পীকারে ফাউলারের গলা ভেসে এল, 'মেনাচিম! এক চুল নড়ো না! এত ব্যথা, মানে এত পুলক আর কখনও পাবে না তুমি!'

ফায়ারিং বাটনে চাপ দিল ফাউলার। মিসাইল বিস্ফোরণের বিকট আওয়াজের মধ্যেও মেনাচিমের আর্তচিৎকার শুনতে পেল সে, অতিমাত্রায় ক্ষীণ হলেও।

লঞ্চ টিউব থেকে বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে মিসাইল, চোখ ধাঁধানো অগ্নিশিখায় পুড়ে ছাই হয়ে গেল মেনাচিম, চোখের পলকে। দরজা বন্ধ করার বোতামটার দিকে ডাইভ দিল রানা। নাগালে পেয়ে টিপে দিল বোতামটা, পরমুহূর্তে লাফ দিয়ে নিরেট স্টীল ডোরের পিছনে সরে এল।

মিসাইল ডোর দ্রুত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মিসাইলের গতি আরও বেশি। রওনা হবার আগে এক পলক ইতস্তত করল মিসাইল, ওঅরহেডটা খসে পড়ল টিউব থেকে, ঝপাৎ করে সরাসরি পানিতে পড়ল ওটা। মিসাইলটার বাকি শরীর দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল, শুধু ফিনগুলো বাধা পেল বন্ধ হতে শুরু করা কবাটে।

ওপর দিকে ছুটল মিসাইল, ভেঙে পিছনে রয়ে গেল ফিনগুলো। ওগুলো না থাকায় দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ল ক্রুজ, কয়েক সেকেন্ড পর বিস্ফোরিত হয়ে বিশাল এক অগ্নিকুণ্ড তৈরি করল

আকাশে। সী ঈলের চারপাশে আবর্জনার টুকরোগুলো বৃষ্টির মত ঝরে পড়ছে।

ক্যাটওয়াক ধরে ছুটে লীনার কাছে চলে এল রানা। সী ঈল ঘন ঘন ঝাঁকি খেতে শুরু করল, আশপাশের পানিতে একের পর এক বিস্ফোরিত হচ্ছে শেল। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল ওরা, তবে চোখের কোণ দিয়ে একজন গার্ডকে দেখে ফেলল রানা। 'তোমার পিছনে,' ফিসফিস করল লীনার কানে। 'বেলা দুটোয়।'

পিছন দিকে না তাকিয়েই পা ছুঁড়ল লীনা, তলপেটে লাথি খেয়ে কোঁক করে উঠল লোকটা। লীনাকে পাশ কাটিয়ে তার গলায় ডান হাতের কোপ মারল রানা। 'টীম হিসেবে আমরা মোটামুটি সফল, কি বলো?' লীনা জবাব দেয়ার সময় পেল না, বাংলাদেশী গানবোটের একটা শেল সরাসরি আঘাত করল সী ঈলের ব্রিজে। বিস্ফোরিত ক্রুজ মিসাইলের চোখ ধাঁধানো আলো সী ঈলকে সহজ টার্গেটে পরিণত করেছে।

*

রানা এজেন্সির জাকার্তা শাখার এজেন্টরা, ইন্দোনেশিয়ান পুলিসের সহায়তায়, এফএমজিএন হেডকোয়ার্টারে হানা দিল। ফাউলারের গার্ডরা বাধা দেয়ার কোন সুযোগই পেল না, কোমরে রশি বেঁধে পুলিস ভ্যানে তোলা হলো সবাইকে। জেনারেল ফুয়াং চুকে পাওয়া গেল মহিলাদের একটা টয়লেটে। গ্রেফতার করে চীনা দূতাবাসে পাঠিয়ে দেয়া হলো তাকে। আধ ঘণ্টার মধ্যে বিশেষ একটা বিমানযোগে বেইজিঙে নিয়ে যাওয়া হবে।

শেষ শেলটার ধাক্কায় অফিসের মেঝেতে ছিটকে পড়ল ম্যাডক

ফাউলার। কামরায় আগুন ধরে গেছে। দিকভ্রান্ত হয়ে পড়েছে সে। কিছু একটা তার মাথায় লেগেছে। ধীরে ধীরে, হাঁপাতে হাঁপাতে, সিধে হলো, দাঁড়াল মনিটরগুলোর সামনে। ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ আন্দাজ করার বা নতুন কোন নির্দেশ দেয়ার আগে ব্রিজ থেকে আগুনের বিশাল আরেকটা লেলিহান শিখা সিঁড়ি হয়ে কামরার ভেতর ঢুকে পড়ল। মনিটরগুলো ফাঁকা হয়ে গেল দেখে রাগে দেয়ালে ঘুসি মারল ফাউলার। পরমুহূর্তে স্থির হয়ে গেল। সবগুলো মনিটরে তার ছবি ফুটে উঠেছে। এফএমজিএন ব্রডকাস্ট, সবেমাত্র স্যাটেলাইটে সাপ্লাই দেয়া হয়েছে, সারা দুনিয়ার দর্শকরা দেখতে পাচ্ছে। তার ছবির ওপর বড় বড় হরফে লেখা- 'নিরুদ্দেশ?'

বোতামে চাপ দিয়ে সাউন্ড অন করল ফাউলার। খবর পাঠিকা বলছে, '...এবং আমাদের এই নেটওঅর্কের মালিক, প্রাণপ্রিয় স্ত্রীর শোকাবহ মৃত্যু সহ্য করতে না পেরে কাউকে কিছু না বলে অজ্ঞাত স্থানে রওনা হয়েছেন বলে অসমর্থিত খবরে প্রকাশ...'

বোতাম টিপে সাউন্ড অফ করল ফাউলার। তারপর আরেক সারি মনিটরে নিজের পিছনটা দেখতে পেল। ঘুরল, অফিসের প্লেট-গ্লাস লাগানো জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা ও লীনা, প্রোবিং মেশিন 'উঁকি'-র পিছনে। উঁকির দাঁত আর ক্যামেরা তার দিকে তাক করা।

'বেলুন ফুটো করা হবে,' বলল রানা। প্রোবিং মেশিনটাকে জানালা দিয়ে ভেতরে ঠেলে দিল ও। সহস্র টুকরো কাঁচ ফাউলার আর মেঝের ওপর ছড়িয়ে পড়ল। অশ্লীল কনট্র্যাপশনটা ধীর কিন্তু সর্পিল গতিতে মিডিয়া সম্রাটের দিকে এগিয়ে আসছে। একটা কিলার হোয়েল বা ভয়ঙ্কর একটা শার্ক-এর চেয়েও মারাত্মক ওটা।

ঘুরন্ত দাঁতগুলোর আওয়াজ শুনে মনে হলো ব্ল্যাকবোর্ডে কেউ নখ আঁচড়াচ্ছে।

রানা আর লীনা শুধু ভিডিও ওয়ালটা দেখতে পাচ্ছে। মনিটরে ফাউলারের চেহারা ক্রমশ বড় হচ্ছে, চিৎকার করার জন্যে মুখ খুলছে সে। 'উঁকি'-র গর্জনে আর হাড় ভাঙার আওয়াজে তার চিৎকার চাপা পড়ে গেল। ব্লেন্ডারে যেমন মাংস ছাতু হয়ে যায়, প্রোবিং মেশিনটাও ফাউলারকে ঠিক তেমনি ছাতু বানিয়ে ফেলল।

সী ঈল ডুবতে আর এক কি দুই মিনিট বাকি। লীনাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি ওখান থেকে বেরিয়ে এল রানা। সুটকেস আকৃতির একটা প্যাকেজ নিয়ে ছুটছিল একজন ক্রু, মারধর করে তার কাছ থেকে সেটা কেড়ে নিল ও। আবার ছুটল, মুচকি হেসে ওর পিছু নিল লীনা। তারপর আরও একজন গার্ডকে দেখা গেল, তার হাতেও ওই একই আকৃতির একটা প্যাকেজ। পা বাড়িয়ে ল্যাং মারল লীনা, প্যাকেজটা লুফে নিল।

দুই পনটুনের মাঝখানে এসে পানিতে লাফ দিল ওরা। ডুব সাঁতার দিয়ে বেরিয়ে এল সী ঈলের তলা থেকে। দ্রুত দূরে সরে আসছে।

প্যাকেজের একটা কর্ড ধরে টান দিল রানা। প্লাস্টিকের মোড়ক খুলে তৈরি হলো একটা ভেলা। ভেলার ওপর চড়ে বসল ও। দেখাদেখি লীনাও তাই করল।

নিরাপদ দূরে সরে আসার পর সী ঈলের দিকে তাকাল ওরা। একটা পনটুন এরইমধ্যে পানির তলায় ডুবে গেছে। আরেকটা শেল এসে পড়ল জাহাজটার মাথায়, দ্বিতীয় পনটুনটাও ডুবে যাচ্ছে। তারপর ধীরে ধীরে উপুড় হলো সী ঈল। আগুনের চোখ

ধাঁধানো একটা বিস্ফোরণের পর ডুবে গেল পুরোপুরি।

'দু'জনের পথ দু'দিকে চলে গেছে,' লীনাকে বলল রানা। 'তবে আরও কিছুক্ষণ আমরা পাশাপাশি থাকতে পারি, কি বলো?'

উত্তরে লীনা বলল, 'একা একটা ভেলায় থাকায় নিজেকে আমার নিঃসঙ্গ লাগছে। তোমার আপত্তি না থাকলে আজ আমরা তোমার ভেলায় থাকি, কাল আমার ভেলায় থাকব?'

কাছাকাছি থেকে একটা জাহাজের সাইরেন বেজে উঠল, তবে রানা বা লীনা সেদিকে মনোযোগ দিল না। সার্চলাইট জ্বেলে ভাসমান আবর্জনার ভেতর কি যেন খুঁজছে গানবোটের ক্রুরা। ভেলা দুটোকে খুঁজে পেতে আরও কিছুক্ষণ সময় লাগবে ওদের।

লাউডস্পীকার থেকে যান্ত্রিক একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'বিসিআই এজেন্ট এমআর নাইন! আপনি কি এদিকে কোথাও আছেন, স্যার? আমাদের কথা শুনতে পেলে হয় কোন শব্দ করুন, নয়তো একটা আলো জ্বালুন। মিস লীনা ওয়াং? আপনি কি আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছেন? দিস ইজ বাংলাদেশ নেভী...'

চিৎকার করে কিছু বলতে যাবে রানা, ওর মুখে হাতচাপা দিল লীনা। 'আরেকটু পর,' ফিসফিস করল সে।

* * *

মাসুদ রানা

টার্গেট বাংলাদেশ

কাজী আনোয়ার হোসেন

পাগলা কুকুর বললেই হয়, মিডিয়া সম্রাট ম্যাডক ফাউলার আগামীকালের খবর আজকের বলে চালাবার অপতৎপরতায় মেতে উঠেছেন। সঙ্গে আছে কবির চৌধুরীর ছেলে টেকনো-টেররিস্ট খায়রুল কবির আর জার্মান কিলিং মেশিন ডিক মেনাচিম। চীনের বিরুদ্ধে ব্রিটেনকে যুদ্ধে নামাবার সমস্ত আয়োজন যখন সম্পন্ন, বাধা হয়ে দাঁড়াল মাসুদ রানা। ব্যক্তিগত আক্রোশ উন্মাদ করে তুলল ফাউলারকে, সিদ্ধান্ত নিলেন নিউক্লিয়ার বোমা ফেলে ঢাকাকে হিরোশিমা বানাবেন। রেডারে ধরা পড়ে না, এমন একটা জাহাজ নিয়ে বঙ্গোপসাগরে ছুটে আসছেন তিনি, সঙ্গে আছে ওঅরহেড ফিট করা ক্রুজ মিসাইল। প্রশ্ন হলো, রানা কি করছে?

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০